বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র জুন ২০০২

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২

উপদেষ্টা

স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ

পৃষ্ঠপোষক

সুব্রত গাঙ্গুলি

প্রকাশক

তপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়
গৌতম গোস্বামী

সম্পাদকমণ্ডলী

বিশ্বনাথ দাস
কমলেশ মণ্ডল

মুদ্রণ

৯৬ এন, ডি. জি. অফসেট
মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ৬০

৩ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : রামবহাল তেওয়ারী
গৌতম গোস্বামী

৭ প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন
তপনকুমার ঘোষ

৯ মায়ের জীবন ও বাণী
বন্দিতা ভট্টাচার্য

১২ বিদ্যামন্দির সমাচার

১৫ সৃষ্টি : আত্মপরিচয় ও আলোচকের চোখে
পুলিন দাস

২৪ লালগড়ের রোজ-নামচা
স্বামী মেধসানন্দ

২৭ কবিতা
অচিন্ত্যকুমার আদিত্য

২৮ বিদ্যামন্দিরের স্মৃতি
বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

৩০ কবিতা
নচিকেতা ভরদ্বাজ

৩১ সুস্বাস্থ্যের দিকে
অমিয়কুমার হাটি

৩৫ কবিতা
অসিতকুমার মিত্র

৩৬ স্মৃতি
সুশান্ত দে

৩৮ বিবেকানন্দ সম্মেলন ও অন্যান্য সংবাদ

সম্পাদকীয়

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বিদেশী ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে থাকতে থাকতে ভারতীয়দের এক সময় মনে হয়েছিল এই বেশ ভাল আছি। রাজা রামমোহন রায় তো জোর গলায় বলেই ছিলেন যে ভগবানের আশীর্বাদে সাহেবরা ভারতবর্ষ শাসন করতে এল। শুধু রামমোহন নন উনিশ শতকের অনেক বুদ্ধিজীবীই সাহেবদের অনুকরণে ভারতীয় ধর্ম, পোশাক, খাবার, পানীয়, ভাষা ইত্যাদি সংস্কারে নেমে গেলেন বিপুল উদ্যোগে। ঔপনিবেশিকতার বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ফ্র্যান্সিস ফ্যানন জানিয়েছেন বহুদিন বিদেশী শাসনের অধীনে থাকলে এমনই নাকি অনেক সময় ঘটে থাকে, রাজনৈতিক পরাধীনতার পাশাপাশি মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার পর্ব শুরু হয়।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মাঝামাঝি পর্বে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটল। তিনি এসে দেখালেন পাশ্চাত্যের ভাণ্ডারে ধন-দৌলত প্রচুর থাকলেও প্রাচ্য সভ্যতার কাছে এ-সব তুচ্ছ। আর তিনি ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি সেকথা বলে এলেন খোদ আমেরিকায় দাঁড়িয়ে। আমাদের আত্মগ্লানি এবং আত্মনিপীড়নের পর্ব শেষ হল। আমরা অনুভব করলাম পরাধীনতার গ্লানি। স্বাধীনতার প্রকৃত সংগ্রাম তখন থেকেই শুরু। রোমাঁ রোলাঁর কথায়—'জাতীয় আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত অবস্থায় ছিল—যতদিন না বিবেকানন্দের বিশ্বাস শ্বাসে ভস্ম উড়ে গিয়ে ভিতর থেকে অগ্নিশিখা লকলকিয়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর তিনবছর পরেই সেই ভয়ানক উদগীরণ ঘটে।' তার ছোঁয়া লেগেছিল প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও। দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম শুরু হয়। বিশ শতকে প্রাচ্যের অনেকগুলি দেশই স্বাধীনতা অর্জন করে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু সময় চলে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক নেতাই এখন প্রয়াত। তাঁদের আত্মত্যাগের কথাও আমাদের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুখ আমরা ভোগ করছি কিন্তু যাঁদের অনুপ্রেরণায় আজ আমরা মুক্ত তাঁদের কথা আর আমাদের তেমন মনে থাকছে না। এর ফলে দুটি নতুন বিপদের মুখোমুখি আমরা। একদিকে অতীতের সন্ধান দেশকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে হানাহানির মধ্যে, অন্যদিকে দেশের জনগোষ্ঠির আর একটি অংশ পৃথিবীর নন্দনকাননের সন্ধানে ছুটছে পশ্চিমে।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটি নতুন করে আর একবার পড়া দরকার। প্রতিটি বাক্যকে বোঝা দরকার, প্রয়োজন প্রতিটি শব্দ উপলব্ধি করার। মানচিত্র খুলে চিনে নেওয়া জরুরি প্রাচ্যের দেশগুলিকে। ভাবা দরকার কি করে হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাদের দিকে। নিজেদের মধ্যে বিবাদে সোনার ডিমপাড়া হাঁস মিলবে না, পরমাণু বোমা এবং অস্ত্রের পেছনে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাবে। প্রাচ্যর দেশগুলির মধ্যে যে অমিল তা বাহ্যিক, আমাদের আবেগ ও অনুভূতিতে কোথাও একটা ভীষণ মিল। সেই মিলের একটি পরিচয় মিলবে এবারের প্রচ্ছদে। এটি চীনা লেখক সংঘের প্রতীক। বছর দেড়েক আগে চীনের পেইচিং শহরে চীনা লেখক সংঘের দপ্তরে এই প্রতীকটি দেখে এর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করি। তাঁরা নিয়ে যান আধুনিক সাহিত্য সংগ্রহশালার চত্বরের গায়ে। সেখানে দেখি বেশ কয়েক টন ওজনের একটি পাথর যার মাঝে একটা 'কমা' চিহ্ন। শতশত কিংবা হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে জলের স্রোত পাথরের গায়ে বয়ে যেতে যেতে সৃষ্টি হয়েছে ঐ চিহ্নটি। ওঁরা ওটিই প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলেন কারণ ঐ প্রাচীন সভ্যতার মানুষজন বিশ্বাস করেন জীবনে কোন যতিচিহ্ন নেই, চলায় কোন ছেদ নেই। চরৈবেতি, চরৈবেতি। প্রাচ্য বিশ্বাসের এও এক নিদর্শন। আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে বেশ মিলও।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : রামবহাল তেওয়ারী

সাক্ষাৎকার : গৌতম গোস্বামী

কত সালে বিদ্যামন্দিরে এলেন এবং কী পড়তে?

১৯৫৬ সালে প্রথম বিদ্যামন্দিরে আসি, ইন্টার মিডিয়েট (বিজ্ঞান) পড়তে।

এর আগে কোথায় পড়তেন?

বীরভূম জেলায় বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ে।

বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ কি ভাবে তৈরি হল?

জন্মসূত্রে আমি উত্তরপ্রদেশী। ছোটবেলা থেকে বোলপুরে আছি। তখন থেকেই আমি স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি বোলপুরের অকৃতদার সন্ন্যাসী-শিক্ষক স্বর্গীয় ভোলানাথ নায়কের। তিনি রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের একজন অনুরাগী সাধক ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। বোলপুরের ঘোষপরিবারের দুই ভ্রাতা মঠের শরণ নিয়েছিলেন— তাঁদের একজন শ্রীমৎস্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। এ-সব নিয়ে মাঝে-মাঝে চর্চাও হত। আমিও শুনতাম, কিন্তু কিছু বুঝতাম না। ভোলাদাই আমাকে বিদ্যামন্দিরে নিয়ে যান ভর্তি করতে। তখন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ। বিদ্যামন্দির ভবনের দোতলার ঘরে তাঁর দপ্তর। ভোলাদা শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে আমাদের আসার কারণ জানিয়ে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্র দেখালেন মহারাজকে। তা দেখে মহারাজ বললেন সরাসরি ভর্তি হওয়া যায় না, আমাকে একটি পরীক্ষা দিতে হবে। তাই অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে আধঘণ্টার মধ্যে ইংরেজিতে এক পাতার রচনা লিখতে নির্দেশ দিলেন। বিষয়—'ট্রাভিলিং ইজ এ পার্ট অব্ এডুকেশন'। লেখাটায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা বিষয়ক একটি উক্তি উল্লেখ করি। সেটি পড়ে মহারাজ খুব খুশী। হাসিমুখে বললেন 'বাঃ বেশ হয়েছে!' তিনি আর্টসে ভর্তি হতে বললেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ভর্তি হতে চাই শুনে আবার জানালেন আর্টসেই আমার ফল ভালো হবে। এমন কি পরীক্ষায় উচ্চস্থানও পেতে পারি। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় আবার শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন এবং শেষে বিজ্ঞানে ভর্তি হবার অনুমতি দিলেন। তারপর তাঁর নির্দেশক্রমে দপ্তরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে আমার ভর্তির পাঠ সমাধা হল। আমরা অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদ্যামন্দিরের বাইরে এলাম। বিস্ময় ভরা চোখে, মনের আনন্দে সব কিছু দেখতে দেখতে মঠে গিয়ে পৌঁছুলাম। শ্রীশ্রী ঠাকুরের মন্দির, শ্রীশ্রী সারদামায়ের মন্দির ও স্বামীজির মন্দির দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে গঙ্গার তীরে এলাম। ভোলাদা ও আমি দু-জনাই গঙ্গায় স্নান করলাম। তারপর মাধবানন্দ মহারাজের দর্শন করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় দর্শন পাইনি। এই ভাবে প্রথমবারের মতো বিদ্যামন্দির এবং রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাই। এই সব কিছুর মধ্যে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ মহারাজের ছবিটি স্বতন্ত্র মহিমায় জ্বলজ্বল করছিল। তার দিন সাতেক পর চিঠি পেয়ে বিদ্যামন্দিরের পশ্চিম ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠি। শুরু হয় বহু আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যামন্দির-জীবন।

এই পরিবেশে এসে আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?

শান্তিনিকেতন আশ্রমের একরকম অস্পষ্ট ধারণা বিদ্যামন্দিরের পরিবেশ বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল মনে মনে। সে কৌতূহল ছিল সংকোচ ও সম্ভ্রমে ভরা। স্নিগ্ধ পরিবেশ, সুস্নিগ্ধ ও সস্নেহ আন্তরিকতাপূর্ণ বিদ্যার মন্দিরে এসে যেন প্রত্যাশায় অতীত কিছু পেয়ে হৃদয়-মন তৃপ্তিতে উছলে উঠল। 'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে/মন মোর নহে রাজি।'

মহারাজের কোন্ দিক্‌টি আপনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল?

অধ্যক্ষ মহারাজের যেমন নাম, তেমনি ব্যক্তিত্ব। তাঁর সরস ব্যক্তিত্বের বিভায় আমরা ছিলাম বিমোহিত। তিনি সহজেই সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও ভয়মিশ্রিত সমীহ আকর্ষণ করতেন। তাঁর ছিল ব্যক্তিত্বদৃপ্ত পদক্ষেপ, সমুন্নতদৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা। বিদ্যার্থী, কর্মী ও সহকর্মিগণের শুভ চিন্তাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। বিদ্যামন্দিরের যথার্থ অভিভাবক ছিলেন তিনিই। সহজ-সরল সুধামাখা, স্নেহভরা মধুরস্মিত হাসি, প্রাণপ্রদ আশীর্বাদ এবং অনলস সক্রিয়তায় জাগিয়ে তুলতেন বিদ্যার্থী হৃদয়ের সুপ্ত কর্মোদ্যমকে। মঙ্গল কর্মের জীবন্ত বিগ্রহ অধ্যক্ষ মহারাজ যেন নীরব আহ্বানে বলতেন—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগো রে সকল দেশ।' স্বামী তেজসানন্দ মহারাজের নিজের পরিচয় আড়ালে রেখে অম্লান বদনে নিরলস কর্তব্য পালন এবং পরমাত্মীয়ের মতো সকলের মঙ্গল সাধনের প্রবণতার দিকই আমাকে বিশেষভাবে অনুরক্ত ও প্রভাবিত করে। তবে তাঁর যে ছবিটি আমার কাছে এখনো অম্লান হয়ে আছে—তা হল— 'ধর্মচর্চা'র কক্ষে আচার্যের উপদেশ দানের মনোমুগ্ধকর তাঁর ছবি। সম্ভবতঃ তার থেকেই পরবর্তী জীবনে আমার শিক্ষকতার

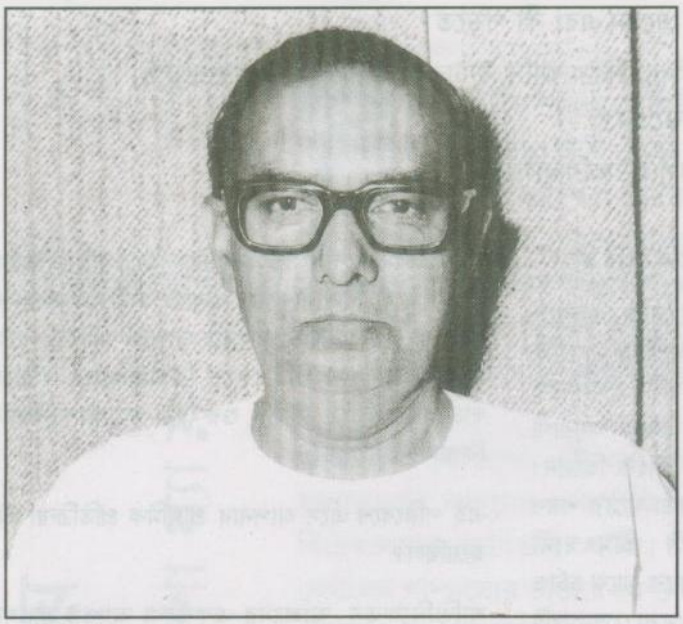

কর্ম নির্ধারিত হয়ে যায়।

আপনাদের ছাত্রাবাসের দায়িত্বে কে ছিলেন?

পশ্চিম ছাত্রাবাসের দায়িত্বে ছিলেন স্বামী অজ্ঞজানন্দ মহারাজ (তারাপদ মহারাজ)। তাঁর সহযোগী ছিলেন অনিল মহারাজ এবং বলরাম মহারাজ। তাঁদের প্রাণভরা আশীর্বাদ, উপদেশ ও সহযোগিতা আমরা বরাবর পেয়েছি। জপ-তপ, ভজন, স্নান-খাওয়া দাওয়া, পড়াশুনো এবং আবাস পরিচালনার অবসরে মহারাজদের দেখেছি ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে, খেলাধুলো এবং আবাসপত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে এবং অসীম উৎসাহে যোগ দিতে।

অধ্যাপক হিসেবে কারা পড়িয়েছেন? তাঁদের মধ্যে কার কার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে?

সেই সময় বিদ্যামন্দিরে যাঁদের কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ (ধর্মীয়পাঠ), গণিতের অধ্যাপক ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার লাহিড়ী, বাংলার অধ্যাপক শীতল ভট্টাচার্য, রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুধাময় গঙ্গোপাধ্যায় ও অধ্যাপক কর (ইংরেজি), অধ্যাপক ঘোষ (প্রাণীবিদ্যা), অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় (পদার্থবিদ্য) প্রমুখের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। তাঁদের বিষয়ানুরাগ এবং ছাত্রবাৎসল্য আর ছাত্রাবাসের নিয়মনিষ্ঠা ও পড়াশোনার অনুকূল বাতাবরণ বিদ্যার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বলে মনে হয়।

এই অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে অধ্যক্ষ তেজসানন্দ মহারাজের কথা। তাঁর কাছে পাওয়া আমার প্রথম এবং মহৎ শিক্ষা হল—কারো ওপর নিজের মতবাদ বা ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিতে নেই। আমি বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে এসেছিলাম। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল আর্টসে ভর্তি হলেই ভালো হবে। বলেও ছিলেন। কিন্তু জোর করেননি। তা ছাড়া অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা পেতাম তাঁকেই। উপাসনাগৃহ, শ্রেণী-কক্ষ, অধ্যক্ষের কক্ষ, জিমনাসিয়াম, খেলার মাঠ, খাবার ঘর, হাসপাতাল, উৎসব-অনুষ্ঠান সর্বত্রই—কোথাও নিশ্চিত কোথাও বা অনিশ্চিত বা আকস্মিক তাঁর উপস্থিতি আমাদের সজাগ, সতর্ক, উৎসাহী এবং নিষ্ঠাবান করে তুলত। তাঁর ধর্মীয় পাঠদানের ভিতর দিয়েই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের ভারতীয় সাধনার ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। যার পরিসমাপ্তি আধুনিকযুগের মহাসমন্বয়ী সাধক ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাধনায় লক্ষিত হয়। ধর্মাচার্যের পাঠদানে যা শুনেছিলাম বিস্ময়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট্ট প্রণামী কবিতায় তার প্রতিধ্বনি পেয়ে আরো বিস্ময়াপন্ন হই। সে কবিতা-কণাটি হল:

'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব'
বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এজগতে
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

রামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ১৩৪২।

বলাই বাহুল্য এই রচনাটি পড়ার সুযোগ পেয়েছি অনেক পরে। জ্ঞান, কর্ম, ধর্ম ও ধ্যানের সমন্বয়েই মানবজীবন চরিতার্থ হয় এ-কথারও ইঙ্গিত পাই অধ্যক্ষ মহারাজের উপদেশেই। সেই চরিতার্থতার খোঁজে জীবন-চক্র আজও গতিশীল।

বন্ধুদের মধ্যে কারা ছিলেন? কোনো বিশেষ স্মৃতি মনে আছে? এখন যোগাযোগ আছে কারো সঙ্গে?

বন্ধু তো আমরা সবাই ছিলাম। এক সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে উপাসনা মন্দিরে যাওয়া, এক সঙ্গে জলযোগ, পড়াশোনা, পুষ্করিণীতে একসঙ্গে স্নান, ভোজন ও ক্লাসে যাওয়া, বিকেলে খেলার মাঠে খেলা, উপাসনা, পড়াশোনা ও আহার, নৈশ আহারের পর পাঠ-আলোচনার সাহায্যে সাহিত্যসভা; আবাসের নিয়ম অনুযায়ী সকলের স্বাস্থ্যাদির খবর রাখার দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কর্মধারা আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলিত হবার পরম বাঞ্ছিত সুযোগ করে দিয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের বন্ধু ছিলাম। তবু যদি নাম করতে হয় তো বলব—তুষার তালুকদার, দীপক সান্যাল, রমেন বসু, রামচাঁদ ভুইয়াঁ, হীরেন ভুইয়াঁ, ধীরাজ প্রমুখ ছিল বিশেষ বন্ধু। তবে বিদ্যামন্দির ছাড়ার পর তুষার তালুকদার ও দীপক সান্যাল ছাড়া আর কারো সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। এ-দুজনের সঙ্গে যোগাযোগও আর আগের মতো নেই। তবে আমরা একে অপরের খবর রাখি। সতীর্থ জয়ন্ত বিশ্বাসের সঙ্গেও যোগাযোগ নতুন স্থাপিত হয়েছে। কলকাতায় বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের মাসান্তে একটা মিলন-সভা "মিলন-চক্র" বসে। এক-একজনের বাড়িতে। খুব আনন্দ, গান-বাজনা, পাঠও আলোচনা শেষে মধুরেণ সমাপ্তি ঘটে। সেই মিলন-সভায় আমি আহূত হয়েছি কিন্তু সাড়া দিতে পারিনি। জানি না সে দুঃখ কবে মিটবে। কিছুদিন আগে জয়ন্তকে আমার 'সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা:জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্ব' বইখানি পড়তে দিয়েছি। বইটি মাসিক মিলন-সভায় চর্চা হয়েছে শুনলাম। অক্ষমতায় ভরা একটি চিঠি দিয়েছিলাম। সেটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে,বন্ধুদের মারফতই জানতে পেরেছি। এই ভাবে

বিদ্যামন্দিরের আমার বন্ধুভাগ্য নিয়ে কিছু বললাম। সে ভাগ্য সুখের।

হস্টেলের কথা কিছু বলবেন?

ছাত্রাবাস ছিল বিদ্যামন্দিরের সম্পূরক। হয়তো তার চাইতেও কিছু বেশি। শ্রেণী-কক্ষে পাঠদানে দেখানো হয় পথ, আর ছাত্রাবাসে অভ্যাস করতে হয় সেই পথে চলার। আমাদের ছাত্রাবাসের বিষয় কিছু-কিছু কথা বলেছি। ছাত্রাবাসে সকালে ও সন্ধ্যায় পড়ার ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। সবাইকে আপন-আপন ঘরে নিঃশব্দে পাঠাভ্যাস করতে হত। মহারাজগণ ঘুরে ঘুরে দেখতেন কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা ঘরেও ঢুকে পড়তেন। সব ঠিকঠাক চলছে দেখে নিঃশব্দে চলেও যেতেন। অনেক সময় আমরা জানতেও পারতাম না। আবার কখনো বা কোনো ঘরে ঢুকে দেখতেন কেউ টেবিলের সামনে বসে ঝিমোচ্ছে। তাকে আস্তে টোকা দিয়ে জাগিয়ে দিতেন। তখন সে বেচারির অপ্রস্তুত অবস্থা সহজেই কল্পনীয়। ছাত্রাবাসের প্রশাসনের কাজের সহায়কদের মধ্যে একজন ছিলেন 'রামভাই'। সবাই তাঁকে এই নামেই ডাকত। তিনি ছিলেন ভোজপুরী-ভাষী। আমিও ভোজপুরী-ভাষী হওয়ায় আমাকে বোধহয় একটু বেশি স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁর কাছে রামগোপাল আগরওয়ালার গল্প শুনতাম। কয়েকবছর আগে যিনি বিদ্যামন্দির থেকে ইন্টার মিডিয়েট আর্টসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর কথাবার্তা, পড়াশোনা, আচার-আচরণের কথা বলতে রামভাইয়ের আনন্দের সীমা থাকত না। অকস্মাৎ একদিন রামগোপাল ছাত্রাবাসে আসায় রামভাইয়ের আনন্দ দেখে কে? আমাকে খুঁজে এনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই রামত্রয়ের মিলন এক অপূর্ব দৃশ্য! সহজ-সরল মৃদুভাষী হাসিমুখ রামভাইয়ের হৃদয়-সম্পদের ছোঁয়া যে কী মূল্যবান আজও মর্মে মর্মে অনুভব করি।

আমি ছিলাম নিরামিষাশী। সুতরাং খাবার ঘরে আমার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা হত। পরিবেশনেও খেয়াল রাখা হত। রান্নার ব্যবস্থাপক, তাঁর সহকর্মী এবং পরিবেশক সকলেই ছিলেন আমাদের প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ। সুতরাং খাবারব্যাপার নিয়ে কোনো দিন টুঁশব্দও শোনা যায়নি। সেখানে কোনো রূপ অশান্তি দেখা দিতেই পারে না। ছাত্রাবাসের এটি একটি স্মরণীয় দিক।

আমি সাঁতার কাটতে জানতাম না। সে কথা জানা-জানি হতেই দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকজন দাদা যারা সাঁতার জানে না তাদের সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব নিলেন। স্নানের সময় তাঁদের উদ্যোগে কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা সাঁতার শিখে নিলাম। এই ভাবে দু-বছরের বিদ্যামন্দিরের বিদ্যার্থী জীবনে কেবল পড়াশোনাই নয়, জীবনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি যা অন্যত্র সুলভ না-ও হতে পারত। বলতে ইচ্ছা করছে—'যা পেয়েছি, যা শিখেছি, তুলনা তার নাই।'

আমাদের ছাত্রাবাসের দায়িত্বে ছিলেন তারাপদ মহারাজ। তিনি পরে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহদৃষ্টি তাঁর তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত অম্লান ছিল। আমাদের শান্তিনিকেতনের আবাসগৃহটি তাঁর চরণধূলি স্পর্শে পবিত্র। সুতরাং বিদ্যামন্দির-ছাত্রাবাসের পবিত্র স্মৃতি আমার জীবনের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে।

কী খাবারে বেশী টান ছিল?

নিরামিষ খাবারের বেশি নয়, পুরোপুরি নির্ভরতা ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর সদস্য রূপে ক্যাম্পে যোগ দিতে গিয়ে অবস্থা দৈন্যে নুন-ভাতের বদলে মাংস ভাত গ্রহণ করতে হয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের উপদেশ ও আদেশে। বিশ্বভারতীর গণিতের অধ্যাপক সুধীর ঘোষাল মহাশয় ছিলেন পরম ছাত্র-বৎসল। তাঁর আদেশ অমান্য করা সম্ভব হয়নি। তারপর খাওয়ার তেমন বাছ বিচার করি না। তবে টানটা নিরামিষের দিকেই। শ্রদ্ধেয় সুধীর ঘোষাল ছিলেন আমাদের কমান্ড্যান্ট।

আর কোনো স্মৃতি?

বিদ্যামন্দিরের প্রথম বর্ষ চলছে। সম্ভবতঃ সেদিন ছিল রবিবার। সাড়ে-দশটা এগারটা নাগাদ আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে গল্প করছি। এমন সময় একটি কালো রঙের অতিসাধারণ মোটর গাড়ি এসে ছাত্রাবাসের সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকেই ডাক শোনা গেল 'রমেন! রমেন!' রমেন আমাদের সঙ্গেই ছিল—হাতধরে টেনে বাইরে চলে এল—'আয় আয় বাবা এসেছেন!'' জানি আমাদের বন্ধু রমেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র। গাড়ির কাছে গিয়ে রমেনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিজ্ঞানাচার্যকে প্রণাম করলাম। তিনি হাসতে হাসতে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। কি সাদাসিদে! পুরু লেন্সের সাদা চশমা, সাদা এলোমেলো মাথার চুল! অতি সাধারণ ধুতি জামা ও জ্যাকেট। মুখের হাসিটি ভারি মিষ্টি। তিনি রমেনকে বললেন—'তুই ধুতি চেয়েছিলি তো, এই নে ধুতি এনেছি।' অতি সাধারণ মোটা সুতোর একটি ধুতি রমেন কে দিলেন। রমেনও দুই হাতে ধুতিটা বুকে জড়িয়ে ধরল হাসিমুখে। তারপর পড়াশোনা এবং অন্য খোজ-খবর নিলেন। আমাদের সঙ্গেও পরিচয় হল। সে পরিচয় পরেও অব্যাহত ছিল। কিছুক্ষণ পরে ঝর-ঝর শব্দ করতে করতে মোটরটি চলে গেল। আমরা বিস্ময় ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকলাম বাংলা তথা ভারতের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিঙের কী অপূর্ব নিদর্শন!

বিদ্যামন্দির পর্বের পর কোথায় গেলেন? বিশ্বভারতীতে কখন এলেন?

বিদ্যামন্দির পর্বের পর আমার বিদ্যাভবন পর্ব শুরু হয়। বিশ্বভারতীর মানবিক শাখা হল বিদ্যাভবন। বিদ্যাভবনের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক করুণাময় মুখোপাধ্যায়। ভর্তি-পরীক্ষা দিয়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়ার সুযোগ পেলাম। কিন্তু নানা কারণে সে বছর অর্থনীতির প্রথম বর্ষের পঠন-পাঠন বন্ধ রাখা হয়। আমাকে তখন বিষয় বদল করে বাংলায় যেতে হয়। তখন বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। পড়া শোনার শেষে বিশ্বভারতীতেই পাঠদান শুরু করি। তা আজও অব্যাহত ।

একজন শিক্ষক হিসাবে বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

শিক্ষার সংকট বিশ্বজুড়ে। সুতরাং আমাদের দেশ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। বরং বলা চলে এখানে তা ক্রমে তীব্রতর রূপ নিচ্ছে। দেশে যখন শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষিতের হার কম ছিল তখন এই সংকটের চরিত্র ছিল ভিন্ন, আজ তা ভিন্নতর। তখন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, আস্থা ছিল, ছিল গৌরববোধ। এখন যা প্রাচীন ভারতীয় বা ভারতীয় তাই পরিত্যাজ্য আর যা পাশ্চাত্য বা বিদেশীয় তাই পরম গ্রাহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধি ও মন আশাতীত ভাবে বিকাশ ও প্রসার লাভ করছে, অন্যদিকে হৃদয়বৃত্তি সংকুচিত ও শুষ্ক হয়ে লোপের পর্যায়ে পৌঁছুতে চাইছে। শিক্ষার লক্ষ্য তো হৃদয় ও মনের বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের জ্ঞানের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গত বিকাশের

মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি পরম বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত হলেও তার আসুরিক শক্তি ও আকর্ষণ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে দৈবিক ও মানবিক শক্তি আকর্ষণ ও উপযোগিতা হারাতে বসেছে। তারই ফলে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আজকের এই অবস্থা। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সন্তানকে বুদ্ধির দানব হবার সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় মানবও হতে হবে। বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে আমরা 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই/ যাহা পাই তাহা চাই না।' তাই আমাদের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক পরিবেশ এমন অস্বাস্থ্যকর, আর আমরা অসুস্থ।

যদি আপনাকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে বলা হয়, কেমন হবে সে প্রতিষ্ঠান? কোথায় গড়বেন?

ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় জীবনাদর্শ এবং বিশ্ব অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলার শিক্ষাই আজ পরম প্রত্যাশিত। এই স্তরের শিক্ষাদান সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব যেখানে প্রচীন ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাত্য এবং স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও লক্ষ্য কে বিচার বিশ্লেষণ করে তাতে যা শুভকর ও কল্যাণকর, শুভ ও কল্যাণের আকর তার সমন্বিত পরম বাঞ্ছিত সারভাগকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্তরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোনো স্থানে গড়ে তুললে কালের প্রভাবে নানা কারণে তা আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং একই সঙ্গে দেশের নানা স্থানে ওই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সার্বজনিক ভিত্তিতে এই বৈপ্লবিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হবে—তবেই সুফল পাওয়া সম্ভব। দেশের বর্তমান শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষাব্যবস্থাপকদের কাছে এ-বিষয়ে অবহিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাই।

আপনার একটি বড়ো পরিচয়, আপনি বিশিষ্ট সমালোচক। আপনার লেখালেখি বিষয়ে কিছু বলুন।

যাঁরা বড়ো (মহৎ) এবং বিশিষ্ট, তাঁরা সহজেই অন্যের মধ্যে বড়োত্ব (মহত্ত্ব) এবং বিশিষ্টতা লক্ষ করে থাকেন। সুতরাং সাধুবাদ জানাই আপনাদের সহজ, সুন্দর স্নেহ এবং ঔদার্যকে।

তবে আমি অল্প-স্বল্প লেখা-লেখি করি একথা ঠিক। সাধারণভাবে তুলনামূলক সাহিত্য আমার বিচরণ ক্ষেত্র। তারই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনাও বোঝার চেষ্টা করি। সেই সুবাদে সাহিত্যের সমালোচনা এবং সাহিত্যের ইতিহাসের দিকেও প্রবণতা গড়ে উঠেছে। আমার আর একটি প্রিয় বিষয় হল ছন্দ, ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা। এই সব বিষয় নিয়ে প্রথমত বাংলা ও হিন্দীতে এবং কখনো বা ইংরেজি এবং ওড়িয়াতে প্রবন্ধ লিখে থাকি। অবশ্য ওড়িয়া প্রবন্ধ বাংলা থেকে ওড়িয়াতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলির শীর্ষকই বলে দেবে বিষয় বৈচিত্র্যের কথা। গোটা চার-পাঁচ বই, শতাধিক প্রবন্ধ সংকলনও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। প্রকাশিত বইগুলি হল:

(১) আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ —১৯৭৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিতব্য); (২) আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ—১৯৮০(ওড়িয়া সংস্করণ,১৯৮৪) (দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিতব্য); (৩) একে ইন্দু দু'য়ে বিন্দু (হিন্দী কাব্যের বঙ্গানুবাদ) ১৯৮২; (৪) সূরপাদরত্নাবলী (সূরদাসের ২৫৫ টি পদ ও তার বঙ্গানুবাদ), ১৯৮৪; (৫) রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ, ১৯৮৬; (৬) হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিতব্য); (৭) রবীন্দ্র প্রবাহ, ১৯৯০; (৮) বঙ্কিম বীক্ষা, ১৯৯৩; (৯) রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দ, ১৯৯৩;(১০) সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা': জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্ব, ১৯৯৯; (১১) প্রবোধচন্দ্র সেন: জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্ব, ২০০০; (১২) রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী সাহিত্য, ২০০১; (১৩) মুন্‌শি প্রেমচন্দ:গল্প উপন্যাস ও গোদান, ২০০১।

লেখা চাই

'প্রাক্তনীবার্তা'-র জন্য লেখা পাঠান। দয়া করে এ-ফোর কাগজের বাঁদিকে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে লিখবেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবেন না। করলেও বাংলা হরফে লিখবেন। নিজের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা এবং বিদ্যামন্দিরের বর্ষকাল উল্লেখ করবেন লেখার শুরুতে। কেবলমাত্র সাদা-কালো ছবি পাঠাবেন।

প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন ২০০০-২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ১৫ অগস্ট ২০০১

তপন কুমার ঘোষ

সংসদের পঞ্চদশ বার্ষিক সভায় সমাগত সকলকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। বিগত ১৫ অগস্ট ২০০০-এ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভাতে ২০০০-২০০৩-এর জন্য নতুন কর্মসমিতি গঠিত হয় অর্থাৎ নতুন কর্মসমিতির এটিই প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা। নতুন কর্মসমিতির প্রথম সভায়, ৯ অগস্ট ২০০০, বর্তমান পদাধিকারীদের নির্বাচন করা হয়। আপনাদের আস্থা এবং বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা দেবার কথা মনে রেখে বিগত একটি বছরে কর্মসমিতি সাধ্যমত যে কাজ করেছে, নীচে তার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

কর্মসমিতি ও উপসমিতির সভা : আলোচ্য আর্থিক বৎসরে কার্যকরী সমিতির পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উপসমিতির বেশ কয়েকটি সভা হয়েছে। বিশেষত পুনর্মিলন উপসমিতি পুনর্মিলনউৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনেকগুলি সভায় মিলিত হয়েছে।

সদস্য সংখ্যা : তিন বছরের অধিককাল চাঁদা বকেয়া থাকলে সদস্যপদ খারিজ করার সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে বার্ষিক সদস্যসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এখন সংসদের বার্ষিক সদস্যের সংখ্যা ১৭। অন্যদিকে আজীবন সদস্যের সংখ্যা এখন বেড়ে ৭৫৮-এ দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য গত বার্ষিক সাধারণ সভার সময় এই সংখ্যা ছিল ৬৫৬।

পুনর্মিলন উৎসব: বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ সাড়ম্বরে বিদ্যামন্দিরে পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বিদ্যামন্দিরের হীরক জয়ন্তী উৎসবেরও শুভ সূচনা হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দুই পর্বে আয়োজিত পুনর্মিলন সভা, ভলিবল প্রতিযোগিতা, খাওয়া-দাওয়া, প্রদর্শনী, আলোকচিত্র গ্রহণ, সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এসব নিয়ে জমজমাট ছিল বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণ। সব মিলিয়ে প্রায় ৭০০ জনের মত প্রাক্তনী এসেছিলেন উৎসবে যোগ দিতে। অতিথি অভ্যাগত মিলিয়ে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ১১০০জন।

এবারের পুনর্মিলন উৎসবকে স্মরণীয় করতে প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষের উপস্থিত মোট ছয়জন প্রাক্তনীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। বিদ্যামন্দিরের দুই সদ্য প্রাক্তনী মৃত্যুঞ্জয় মেদ্দা এবং পার্থপ্রতিম বসুকে যথাক্রমে চন্দ্রনাথ দে স্মারক বৃত্তি এবং হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তিতে সম্মানিত করা হয়। প্রসঙ্গত প্রথম বৃত্তিটির ব্যবস্থা করেছেন প্রাক্তনী সংসদের প্রয়াত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দে-র পত্নী শ্রীমতী শ্রাবণী দে এবং দ্বিতীয় বৃত্তিটি দিয়েছেন প্রাক্তনী ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি।

পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে অন্যান্যবারের মত এবারেও একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্মারকগ্রন্থের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহে প্রাক্তনীদের অনেকেই সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

স্বামী বিমুক্তানন্দ ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্মারক বৃত্তি : ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই দুই বৃত্তি বাবদ মোট ৬০০০ টাকা বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যামন্দিরের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের পঠন পাঠনের সুবিধা বাড়াবার জন্য এই বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো দরকার। আশা করি সমাগত প্রাক্তনীরা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস : এবারে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়। জেলার প্রায় ২০০ টি বিদ্যালয়ের ২০০০-এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র জেলাকে নরেন্দ্রপুর, সাগরদ্বীপ, ক্যানিং, বারুইপুর, সরিষা, নিমপীঠ এই ছ'টি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে আঞ্চলিক স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০০০। প্রকাশ্য অধিবেশন সহ সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় স্বামীজির জন্মদিবসের প্রাক্‌কালে ৭ জানুয়ারি ২০০০-এ নরেন্দ্রপুর সভাঘরে।

২০০১-এর বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলাকে। বিগত ২২ জুলাই ২০০১ তারিখে প্রস্তুতি বিষয়ক প্রথম সভাটি সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বিদ্যামন্দিরে। বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনী সংসদের প্রতিনিধি, জেলার সমস্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং বারাসত, বেলঘরিয়া ও রহড়া আশ্রমের সন্ন্যাসী প্রতিনিধিদের আলোচনায় স্থির হয়েছে আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০০২-এ রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে (বেলঘরিয়া) মূল সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। জেলাস্তরের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা বারাসাত আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় বারাসাতে অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য সমগ্র জেলাকে সুন্দরবন, গোবরডাঙা, হাবড়া, দমদম, সোদপুর ও বসিরহাট— এই ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় এই উৎসবে

আপনাদের সক্রিয় যোগদান কামনা করি।

স্বাস্থ্য প্রকল্প : ১৯৯৩-এর ৪ জুলাই শেঠবাগান স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। প্রায় আটবছর ধরে এই প্রকল্প এলাকার দরিদ্র মানুষদের প্রয়োজন মিটিয়ে এলেও গত প্রায় দুবছর ধরে প্রকল্পটির পরিচালনায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের ভ্রাম্যমান সেবার মাধ্যমে আপাতত এই প্রকল্পে মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমরা প্রকল্পটি প্রত্যাহার করেছি।

স্বাস্থ্যসেবার বিকল্প সম্ভাবনার সন্ধান করতে গিয়ে আমরা অনুভব করি যে বিদ্যামন্দিরের কাছাকাছি কোথাও এই প্রকল্প চালু করতে পারলে পরিচালনার কাজ সহজ হয়। সেইমত বেলুড় রেল স্টেশনের পশ্চিমপারে পঞ্চায়েত এলাকায় অতি দুর্গত সাঁপুইপাড়া অঞ্চলে আমরা চিকিৎসা প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিই। দফায় দফায় এলাকার বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তারপর সমীক্ষার ভিত্তিতে ২০০টি দরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কার্ড দেওয়া হয়। বিগত ১৪ মে ২০০১-এ বাংলা নববর্ষের দিনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির উদ্বোধন হয়েছে। আপাতত শনি এবং বুধ—সপ্তাহের এই দুদিন চিকিৎসার কাজ চলছে। বুধবার সাধারণ চিকিৎসা ছাড়াও একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞের সাহায্যও পাচ্ছেন রোগীরা। যাতায়াত এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ডাক্তারবাবুদের সামান্য পারিশ্রমিকও দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের জন্য একটি আলমারি, ওজন মাপার যন্ত্র ও অন্যান্য কিছু সরঞ্জাম কিনতে প্রায় ছ'হাজার টাকার মতো ব্যয় হয়েছে। স্থানীয় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মলয় মৈত্র কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করেছেন। প্রাক্তনী সংসদের কর্মসমিতির সদস্য আশিষ রায় রোগী দেখবার টেবিল বানাবার জন্য প্রায় ১০০০ টাকা দিয়েছেন। কর্ম-সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকল্প বাবদ ৫০০ টাকা করে দিয়েছেন।

নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্পে ওষুধপত্রসহ সকল পরিষেবা সঠিক মাত্রায় এবং দক্ষতায় দেবার চেষ্টা করছে। রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। স্থানীয় চিকিৎসক এবং আমাদের কিছু প্রাক্তনী বন্ধুও ওষুধপত্র সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন। তবু ওষুধপত্র কিনতে হচ্ছে প্রতি মাসে প্রায় ১৫০০ টাকার মত। আপাতত মাসে গড়ে প্রায় তিনহাজার টাকা খরচ হচ্ছে এই প্রকল্পে। এই বাবদ স্থায়ী তহবিল তৈরি করা এবং নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের জন্য আপনাদের সহায়তা ও পরামর্শ আমাদের একান্তভাবে কাম্য।

স্থানীয় দুটি সংগঠন—পল্লী উন্নয়ন সমিতি, সাঁপুইপাড়া এবং বালি গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র—প্রকল্পের কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করছেন। পল্লী উন্নয়ন সমিতির ঘরেই চিকিৎসার কাজ চলছে। সংসদের আংশিব সময়ের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঘোষ চিরচরিত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে প্রকল্পের কাজকর্ম দেখাশোনা করছেন।

স্বামী তেজসানন্দ রচনা সংগ্রহ : দুবছর আগে প্রকাশিত হয়েছে এই অমূল্য সংকলনটি। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের বুলেটিন এবং বেদান্ত কেশরী পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনায় অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়েছে গ্রন্থটির। তবে এখনও এটির বেশির ভাগই বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। আপনাদের এবিষয়ে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানাই। আপনারা নিশ্চই জানেন যে এটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যামন্দিরের দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি তহবিল গঠনের কাজেই প্রধানত ব্যয় করা হবে।

প্রাক্তনীবার্তা : এবারে প্রাক্তনীবার্তার একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাক্তনীবার্তার জন্য লেখা দেওয়া বা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য আপনাদের অনুরোধ করি। আশা করি পুনর্মিলন উৎসবের দিনে প্রকাশিত প্রাক্তনীবার্তার বিগত সংখ্যাটি গুণমানে আপনাদের সন্তুষ্ট করেছে।

আর্থিক সহায়তা : গুজরাটের ভূমিকম্প ত্রাণে প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ তহবিলে ৫০০০ টাকা দান করা হয়েছে। এবছরেও বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান করণিক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মোট ১২০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

স্মারক বক্তৃতা : প্রাক্তনী সংসদের উদ্যোগে এবার দুটি স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হয়েছে। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার দিনে (১৫ অগস্ট ২০০০) রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর ট্রাস্টের সম্পাদক শ্রী কুশল চৌধুরী। আজই সকালে দ্বিতীয় রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা দিলেন লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী বন্দিতা ভট্টাচার্য। এবার থেকে স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তনী সংসদ। প্রখ্যাত শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ১৮ নভেম্বর ২০০০ তারিখে ভারতীয় ললিতকলা বিষয়ে বিবেকানন্দ সভাগৃহে এই ভাষণ দেন।

শোকসংবাদ : রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা তহবিল তৈরি হয়েছে যাঁর দানে সেই তারাপদ দাস মহাশয় আর আমাদের মধ্যে নেই। গতবছরেও এই দিনে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি উদ্বোধনী বক্তৃতা সভায় হাজির ছিলেন। আমাদের মধ্যে নেই অশেষ রায়। কয়েকমাস আগে আমরা হারিয়েছি বিদ্যামন্দিরের অর্থনীতি বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রাক্তনী সুজিৎকুমার ঘোষকে। বিদ্যামন্দিরের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষও প্রয়াত হয়েছেন। এঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে আমরা এঁদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা : বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ ও উপাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সংসদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হত না। এছাড়া অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীগণ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রদের অনেকেই সংসদের কাজে সাহায্য করেছেন। অন্যান্য বছরের মতো এবছরের হিসাবপত্রও বিনা পারিশ্রমিকে পরীক্ষা করেছেন কলকাতার মনীষীকুমার দেব অ্যান্ড কোম্পানীর পক্ষে প্রাক্তনী মনোজ ভট্টাচার্য। কোষাধ্যক্ষ স্বপনকুমার চক্রবর্তী শারীরিক ও অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দক্ষ হাতে হিসাব রক্ষার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাকর্মী দেবব্রত মণ্ডল এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

অনেক সংশয় নিয়ে সংসদ তৈরি হয়েছিল আজ থেকে পনের বছর আগে। তখন ভাবনা ছিল ঠিক কেমন হবে সংসদের কাজকর্মের রূপরেখা। আজ এই কাজ একটি সুস্পষ্ট চেহারা পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এখনও স্থায়ী তহবিল তৈরি করতে পারিনি আমরা। এ বিষয়ে ভাবা দরকার। সংসদের ক্রমবর্ধমান কাজের দায়িত্ব ঠিকমত সামলাতে দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রাক্তনীরাও এগিয়ে আসুন। এবছর আমাদের সকলের প্রিয় বিদ্যামন্দিরের হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে সংসদ তথা প্রাক্তনীরা ঠিক কী কী কর্মসূচি নিতে পারেন সে বিষয়ে আপনাদের সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার অনুরোধ জানিয়ে এবং সকলকে আর একবার সশ্রদ্ধ স্বাগত জানিয়ে শেষ করছি।

মায়ের জীবন ও বাণী

রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা

নিবেদিতা ভট্টাচার্য

অতি প্রিয় এই বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ আজকে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সর্বপ্রথমেই আমি এই অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের যথাক্রমে প্রণাম, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জ্ঞাপন করি।

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আমার কাছে পরম পবিত্র ক্ষেত্র। আর সে জন্য আমি যখনই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাই মনে হয় আমি তীর্থ পরিক্রমায় এসেছি। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির আমার কাছে শুধু পরম পবিত্র স্থান নয়, এটি একটি মন্দির এবং তীর্থক্ষেত্র। তাই এখানে যখন আসি তখন আপনা থেকেই মাথাটা নিচু হয়ে আসে। প্রণাম জানাতে জানাতে আমি প্রবেশ করি। তাই এখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ যখন আমাকে বললেন 'রাণী রাসমণি স্মারক' বক্তৃতা দিতে তখন আমার সংকোচ এবং দীনতা আমাকে বড় সঙ্কুচিত করেছিল। কিন্তু ঐ যে লোভ— বিদ্যামন্দিরে যাব এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হব— সেইজন্য আমি এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। আজকে ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহোদয় আমাকে যে পুষ্পস্তবক দিলেন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে, আমি তার যোগ্য নই। তবু আমি বলব যে এর মাধ্যমে তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করছেন আমার যাতে কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়। সেইজন্য আজকে এই পুষ্পস্তবকটি আমি গ্রহণ করেছি।

এই বক্তৃতা ভারতীয় আদর্শের যে সমস্ত মহিলারা ভারতবর্ষকে আলংকৃত করেছেন, তাঁদের নিয়ে। আমাদের ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রী মা। 'বর্তমান পৃথিবীর মহোত্তমা নারী মা সারদা দেবী'—একথা বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। কিন্তু যিনি পৃথিবীর মহোত্তমা নারী হবেন তাঁকে তো অনেকদিক দিয়ে মহিমাভূষিত হতে হবে। তাঁর চরিত্রের অলংকারগুলি আমাদের জানতে হবে এবং তিনি আমাদের কাছে কোন মহিমায় মহিমান্বিত হবেন সেও ভেবে দেখতে হবে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে কী কৌশলে এক সন্তানহীনা নারী সকলের 'মা' হয়ে উঠলেন সে প্রশ্নের উত্তর নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় পৃথিবীতে এমন একটিও নারী আবির্ভূতা হননি যিনি তাঁর পিতৃদত্ত নামটি 'মা' নামের আড়ালে পুরোপুরি ভুলে গেলেন। মায়ের সঙ্গে সন্তানের একটা মধুর সম্পর্ক। তাই যখন কোনো সন্তান বিপদে পড়ে তখন সে প্রথমেই মায়ের কথা স্মরণ করে। মাকে ডাকা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকে না। পুজোর সব আয়োজন সেরে ঘট ভরতে গিয়ে যদি পাঁকে আমার পা আটকে যায় তখন সেই নিরুপায় অবস্থায় আমরা মাকে ছাড়া কাকে ডাকব? সন্তানরা তো প্রথমেই মাকে ডাকে, বাবার চেয়ে আগে। সেইজন্য মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক বড় মধুর সম্পর্ক। 'মা বলে কাছে এসে দাঁড়ালে আমি সব ভুলে যাই', এই তো অভয়বাণী। আরো বলেছেন যে মায়ের কাছে সন্তানের কোনো অপরাধ হয় না। এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে মায়ের স্নেহের এবং করুণার পরিচয় যেভাবে প্রকাশিত হল অন্য কোনো ভাষায় তা প্রকাশ সম্ভব কিনা আমার জানা নেই। নদীর উপর দিয়ে একটি জাহাজ চলে গেল। যখন জাহাজটি গেল তখন তার চারিদিকে একটু আলোড়নের সৃষ্টি হল ঠিকই কিন্তু বিশেষ কিছু টের পাওয়া গেল না। টের পাওয়া গেল তখন যখন জাহাজের জল-ভাঙা ঢেউগুলি ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হয়ে নদীর পাড়ে এসে আছড়ে পড়ল। ঢেউগুলোই তো জাহাজের গুরুত্ব স্বীকার করে। আমাদের শ্রীশ্রী মায়ের ভাবধারাও তেমনি তদানীন্তন সমাজের বুকে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর তিরোধানের প্রায় একাশি বছর হতে চলল। এই একাশি বছর পরেও তার তরঙ্গ বহুগুণে স্ফীত হয়েছে, হয়ে বর্তমান সমাজের চিন্তাশীল মানুষদের প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে, আর সে কম্পন আজ আমরা অনুভব করতে পারছি। আমাদের জীবনে নানা সমস্যা, নানা সংকট। সেই সমস্যা এবং সংকটের দ্বারে দ্বারে মায়ের কৃপারশ্মি এসে প্রবলভাবে আঘাত করেছে, নাড়া দিচ্ছে। যেন সে প্রতিটি রন্ধ্র পথে ঢুকে যেতে চাইছে আর বলছে— উত্তিষ্ঠতঃ, জাগ্রত, জাগ্রত। সুতরাং বাঁচবার পথ নেই। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ধ্যানে, কর্মে, নিদ্রায়, স্বপ্নে, জাগরণে—মাকে স্মরণ করা আমাদের একমাত্র বাঁচবার পথ।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন জগতের মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি কী বলে গিয়েছিলেন তা সঠিক আমরা বুঝতেও পারিনি, ধরতেও পারিনি। পাখির বুলির মতো আবৃত্তি করি মাত্র। তাই অসীম কৃপাময়ী শক্তিরূপিনী মা এলেন আমাদের হাত ধরে ঠাকুরের আদর্শকে দেখাবেন বলে এবং সেইজন্য তাঁকে অনেক দুঃখকষ্ট স্বীকার করে সুদীর্ঘ কাল গার্হস্থ্য জীবনযাপন করতে হল। তিনি আদর্শ সন্ন্যাসিনীর আবার আদর্শ গৃহিণীও। তাই গৃহস্থদের দাবি ষোলো আনা আমাদের। আমরা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী চাই না, আমরা জগদ্ধাত্রীকে চাই না। আমরা আদ্যাশক্তিকে চাই না— আমর চাই মায়ের সেই হলুদমাখা হাতদুটি। জয়রামবাটিতে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দেয়া স্নেহে ও করুণায় বিগলিতা মাকেই আমরা চিনি, সেই মাকেই আমরা জানি। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে আমরা ধরতে পারি না। আদ্যাশক্তি মহামায়াকে আমরা চোখে দেখতে পাই না, জগদ্ধাত্রীকেও আমরা ধরতে পারি

না কিন্তু এই মাকে আমরা অত্যন্ত সহজভাবে, সাধারণভাবে ধরতে পারি কারণ এই মা আমাদের জন্য এসেছেন, একমাত্র আমাদের জন্য। ঠাকুর আমাদের জন্যই এই মাকে রেখে গেলেন। মা এলেন নিঃশব্দে নৈঃশব্দের পণ নিয়ে— যে নৈঃশব্দ সারা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছিল, পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। মা এলেন সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে, সকলের অগোচরে—লজ্জাপটাবৃতা হয়ে, অবগুণ্ঠনবতী হয়ে।

অবশ্য এর আগে আমরা দেখেছি গার্গী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী— এঁরা সব বেদ-বেদান্ত, কাব্য-মহাকাব্যের নায়িকা হয়ে এসেছেন কিন্তু আমাদের মা কোনো কাব্য মহাকাব্য, বেদ বেদান্তের নায়িকা হয়ে আসেননি। তিনি অত্যন্ত ঘরোয়া, সাদামাঠারূপে এসেছেন অথচ সীতার পতিব্রত্য, সাবিত্রীর দৃঢ়তা, গার্গীর প্রজ্ঞা, খনা-লীলাবতীর জ্ঞান নিয়ে তিনি সকলের অগোচরে অত্যন্ত সঙ্গোপনে এলেন আর তিনি নহবতে সীতার মতো বন্দিনী জীবনযাপন করলেন। নহবতের অন্ধকার ঘরে ঐ যে শান্ত স্নিগ্ধ দীপশিখাটি সে জাত প্রদীপের মতো নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে শক্তির আলো বিকিরণ করেছে। প্রদীপটিকে দেখা যায়নি কোনোদিন কিন্তু আলোকটিকে দেখা গেছে। তবু এটি নিত্য সত্য। মায়ের কথা মনে হলেই মনে হয় পল্লীর কুটিরের সেই তুলসীতলার স্নিগ্ধ প্রদীপ যার আলো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ সেই আলো মানুষকে শান্তি দিচ্ছে, স্নিগ্ধ করছে, মানুষের সমস্ত পাপ-তাপ, ভয়, খেদ, ক্লেশ, কালিমা দূর করে দিচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবন নাটকের মধ্যমণি মা সারদা। কিন্তু তিনি কোনোদিন নিজেকে পাদপ্রদীপের সামনে আনেননি, চিরকাল প্রচ্ছদপট হয়েই রইলেন। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশে তারার আলোয় যেমন আমরা সেই সন্ধ্যাতারাটিকে পথনির্দেশের স্মারকরূপে গণ্য করি তেমনি বিশ্বের ধর্ম ইতিহাসে আমাদের মা সারদাদেবী একক এবং অনন্য সাধারণ। শিশিরবিন্দু সারারাত ধরে ফুলের উপর ঝরে পড়ে এবং সকালে আমরা বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপগুলিকে দেখি মুগ্ধ হয়ে যাই— কী টাটকা, কী তাজা, কী সতেজ ফুলগুলি! কিন্তু সারারাত ধরে যে শিশিরবিন্দু এই ফুলগুলিকে ফোটালো কই তার কথা ত আমরা একবারও মনে করি না! আমাদের শ্রীশ্রী মাও এই শিশির বিন্দুর মতো। তিনি জগতের মহৎ আদর্শের পুষ্পরাজিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করেছেন এবং সকলের অলক্ষ্যে সঙ্গোপনে এবং সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে তিনি এমন একটি শান্ত, স্নিগ্ধ আদর্শ জীবনযাপন করেছেন যা ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। সীতার মতো যখন নহবতের অন্ধকার কারাগৃহে তিনি বন্দিনী জীবনযাপন করলেন তখন তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অনুযোগ নেই। দক্ষিণেশ্বরে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ—মধ্যাহ্ন গগনের দীপ্ত সূর্যের মতো তাঁর সেই নিত্য সঙ্গীত সকলে উপভোগ করছেন কিন্তু সেই আনন্দযজ্ঞে কেবল একজন মাত্র বঞ্চিতা। তিনি দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখদুটি রেখেছেন আর বলছেন—'মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ তাঁর দেখা পাবি?' এমন কোনো কাহিনী নেই যা এই ঘটনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিতে পারে এমন কোনো কাব্য নেই যা এই আত্মবিলয়ের মহিমা কীর্তন করতে পারে। সূর্যের জ্যোতির দিকে আমরা তাকাতে পারি না কিন্তু সেই সূর্য যখন জ্যোতিকে আড়াল করে সে চাঁদের বুকে জ্যোৎস্না হয়ে উথ্‌লে পড়ে তখন তার পরম স্নিগ্ধ আলোতে আমরা স্নান করি। শ্রীশ্রী মাও তেমনি তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্যকে আড়াল করে লজ্জাপটাবৃতা কুলবধূরূপে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর আবির্ভাবকে আমরা এক কথায় বলতে পারি একটা বিপ্লব। যিনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী, বাগ্‌বাদিনী যাঁর কণ্ঠে স্বয়ং বিরাজিতা, যিনি স্বয়ং সারদা সরস্বতী তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে এক আনা দিয়ে একটি বর্ণপরিচয় এনে পড়ছেন। হৃদয় তাও আবার হাত থেকে কেড়ে নিল, মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ভালো নয়। শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে! অশিক্ষিতা কুলবধূর এই মহাবিদ্যার আড়ালে এ এক অভিনব লীলা আমরা বলতে পারি। এই রূপ ঢাকা রূপের যেন তুলনা নেই। এত মাধুর্য অন্য কোনো মাতৃরূপের মধ্যে এর আগে আমরা দেখিনি। কিন্তু মায়ের চরিত্রের দৃঢ়তা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসন্নতা, সংবেদনশীলতা, সহানুভূতিশীলতা সর্বদাই প্রবাহিত। ঘোর তমোগুণে যে সমস্ত মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে আছে তারা এই মহাজীবনের মহিমা বুঝতে সক্ষম হবে না। এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ ইতিপূর্বে এরকম কোনো দৃষ্টান্ত মানবসংসারে আমরা খুঁজে পাইনি, তাই এই অভিনবত্বের অধিকারিণী আমাদের মা। তাই দেখি কখনও তিনি ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করে পরে লজ্জা নিবারণ করছেন, কখনও অলংকার এবং অর্থ মাথায় ঠেকাচ্ছেন আর বলছেন—'বাবা, আমি তো মেয়েমানুষ।' আবার কখনও দেখছি যে সকলের সংগে 'বসুধৈবকুটুম্বকম্' করছেন এবং রাধু ও রাধুদির মায়ের অত্যাচার সহ্য করছেন। ভাইদের সংসারে তিনি সুখে দুঃখে কাটাচ্ছেন আবার বৈপরীত্যে দেখি তিনি ডাকাত বাবা ও ডাকাত মায়ের সংগে দেশ কাল জাতির অতীত সম্পর্ক স্থাপনা করছেন আর নিবেদিতার তৈরি খাবার মুখে দিচ্ছেন। তুঁতে মুসলমান ডাকাতের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করছেন। শুচি অশুচি, পাপ- পুণ্য, ভাল-মন্দ সবকিছুর ঊর্ধ্বে একটা অতি শুদ্ধ ভাবরাজ্যের মধ্যে বিচরণ করছেন। কিন্তু মা ভুলে যাননি আমাদের কথা, সংসারী মানুষদের কথা। মা সর্বদাই বলতেন, 'আমি আমার সন্ন্যাসী সন্তানদের কথা চিন্তা করি না, তারা জপ ধ্যান করে হু-হু করে ওপরে উঠে যাবে কিন্তু আমার সংসারী ছেলেমেয়েরা যারা অবলা জীবের মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি যদি তাদের ভার না নিই তাহলে কে নেবে?' মা অঙ্গীকার বদ্ধ, মা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের ভার তিনি গ্রহণ করবেন। নিজে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তবু বলছেন আমার সন্তানেরা যেন সুখে থাকে, যেন ভাল থাকে। সমস্ত সন্তানের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য তিনি শারীরিক কষ্টকেও উপেক্ষা করেছেন, কখনও তাকে আমল দেননি। জীবনে শান্তি পাবার পথটিও মা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন যে 'যদি শান্তি পেতে চাও মা তাহলে কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের, সকলকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ তোমার পর নয় মা, জগৎ তোমার আপনার'। এই অংশটির আমরা দুটি ভাগ দেখতে পাই— যদি শান্তি পেতে চাও মা তাহলে কারো দোষ দেখোনা, দোষ দেখবে নিজের। এই অংশটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শান্তির পথ নির্দেশ করে। আর দ্বিতীয় অংশটি হল 'জগৎ তোমার আপনার'। তাতে মনে হয় যে বেদান্তে উক্ত সেই চিরন্তন সত্য যা ভারতের শাশ্বত বাণী তা মায়ের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মা বলছেন ভগবানের কাছে চাইতে হয়— 'নির্বাসনা'। বাসনার নির্বাণেই তো সুখ। তাই ভগবানের কাছে সর্বদা নির্বাসনা প্রার্থনা করবে। আরও বললেন—'ঠাকুর, আমি আর কারো দোষ দেখতে পাই না'। সুতরাং মা যে আমাদের, মা যে কেবল একটি কালের নয়, চিরকালের এবং সেই মাকে আমরা কি করে ভুলে যাবো? সেইজন্য মনে হয় যে মা সত্যিকারের মা। তাই গিরীশ ঘোষ যখন মায়ের পদপ্রান্তে লুটিয়ে বলেছিলেন—'বলো মা তুমি কেমনতর মা', তখন মা খুব স্পষ্ট স্নিগ্ধ সুরে নিজমুখে বলেছিলেন —আমি পাতানো মা নই, আমি নকল ডাকের মা নই, আমি গুরু-স্ত্রী রূপে মা নই, আমি সত্য সত্য জননী। আমি জন্ম-জন্মান্তরের মা, যুগ-যুগান্তরের মা।' তা সেই যদি জন্ম-জন্মান্তরে মা, যুগ-যুগান্তরের মা হন, তিনি কি তাঁর সন্তানদের ভুলে যাবেন? আমাদের হতাশাজর্জরপ্রাণে,

আত্ম পীড়িতের যন্ত্রণায় মা এসেছেন। মানুষের দুঃখ ক্লেশ নিজের বক্ষে ধারণ করে অন্য মানুষের হৃদয়ে প্রাণের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেবার জন্যই আজ তিনি এসেছেন আমাদের মধ্যে। মা আজও আছেন। হয়তো স্থূলদেহে নেই কিন্তু সুক্ষ্ম দেহে মা সর্বদাই বিরাজ করছেন। আমাদের পাশাপাশি রয়েছেন। তাই মা বলেছেন যে সর্বদা মনে রাখবে আর কেউ না থাক তোমার একজন মা আছেন।

'শরৎ' মায়ের একটি অনাঘ্রাত কুসুম, আমজাদ তাঁর কীটদগ্ধ পুষ্প। কিন্তু দুইই সমান আদরের মায়ের কাছে। দুজনকেই তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। মায়ের একবারেও মনে হয় না যে তাঁর 'শরৎ আমার যেমন ছেলে আমজাদও আমার তেমন ছেলে' কথাটি শুনলে শরৎ মহারাজ কি মনে করবেন। মা এ কথা মনে করতেই পারেন না কারণ মায়ের যে বুকে রয়েছে অসীম ভালোবাসার একটি ভাণ্ড। আর রয়েছে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস থেকেই আসে অপরকে বিশ্বাস করার একটা প্রবণতা।

আজকের যুগে আমরা দেখছি যে একটা বিরাট ব্যাধি, একটা মারাত্মক ব্যাধি—সেটা হচ্ছে ভালোবাসাহীনতা। আমাদের জীবন থেকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মানবিকতাবোধ সব চলে গেছে, জীবনটা হয়ে উঠেছে শুষ্ক মরুভূমির মতো। তখন আমাদের কি প্রয়োজন? অগাধ ভালোবাসার সঞ্চয়ে ভরা মায়ের জীবনটিকে অনুধ্যান করা কারণ মা যে আমাদের একান্তআপন, তিনি সত্যিকারের মা। আর এই মা যখন বলেছেন যে আমার মধ্যেও যিনি তোমার মধ্যেও তিনি—তুমি আমার অম্বিকে দাদা— একজন বাগ্‌দিকে যখন বলছেন তখন মনে হয় যে আজকের যুগে আজকের দিনে যে চিন্তা ও যে প্রয়োজন মায়ের সমগ্র জীবনটি সেই সাম্যবোধের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এই কথাটি বলার পেছনে আমরা দেখি যে মায়ের একটি আত্মজ্ঞান ছিলো। 'জীব-ই শিব'—এই তত্ত্ব ব্যাপক ও বৃহৎ অর্থে মায়ের জীবনে রূপায়িত হয়েছিল। তা না হলে সেই যে শিহড়ের পাগলটা অন্ধকার রাত্রিতে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে কি করে মায়ের কাছে এক আঁটি সজনে শাক নিয়ে উপস্থিত হল? আসলে সুপ্ত, অবহেলিত অবজ্ঞাত মানুষের হৃদয়ে মা দেবত্বের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই মায়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিচয় তিনি মা। আদর্শ কন্যা হিসেবেও তিনি মা, আদর্শ ভগিনী হিসেবেও তিনি মা। আদর্শ জায়ারূপেও তিনি মা এবং আদর্শ জননী রূপেও মা এবং গুরুরূপেও মা—মাতৃত্বই তাঁর প্রথম থেকে শেষ কথা। আমরা দেখছি একদল সাপুড়ে এসেছে, মাকে সাপখেলা দেখাচ্ছে। চলে যাবার সময় মা সাপুড়েদের দলপতিকে ডেকে প্রচুর বক্‌শিস গুড়-মুড়ি দিলেন। আর শুধু তাই নয় একখানি কাপড় দিলেন। চলে যাচ্ছে যখন সেই সাপুড়ে দলপতি, একজন কে যেন বলে উঠলেন 'ওদের আবার ছোঁয়া কেন'। তখন মা বলছেন, 'সেকি! সে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল আর আমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবোনি'! এই যে আশীর্বাদ যা কোনোদিন জাতি গোত্রের বন্ধন মানেনি, যে আশীর্বাদ শরৎ মহারাজের মাথা থেকে অন্ত্যজ মুসলমান ডাকাত আমজাদের মাথায়ও বর্ষিত হয়েছিল সেই আশীর্বাদ আজও গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের মতো করুণাধারায় প্রবাহিত। আর মা ঘরে ঘরে এই আশীর্বাদই রেখে গিয়েছিলেন যে 'সকলের দৃষ্টি জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হোক'। মা ভুলে যাননি তাই চলে যাবার আগে তিনি মহাকালের বুকে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর আশীর্বাদের ফুল—'যারা এসেছে, যারা আসেনি, যারা আসবে সকলকে জানিয়ে দিও মা আমার ভালোবাসা আর সকলের উপর রইল আমার আশীর্বাদ।' আর এই আশীর্বাদ আছে বলেই তো তাঁর সন্তানেরা আজও দুঃখের সমুদ্র ডিঙিয়ে বেঁচে ওঠা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয় কারণ তারা জানে এখানেই করুণাময়ী মায়ের সমস্ত স্নেহ এবং ভালোবাসা আছে। তাই আজকের দিনে আমরা সকলে মিলে বলব যে মাকে আমাদের চাই। কি পুরুষ, কি নারী মাকে যদি আমাদের জীবনের আদর্শ করি তাহলে আমাদের সমাজে, আমাদের সংসারে যেখানে সংকট যেখানে সমস্যা তারতো কিছু নিরসন হবেই কারণ মা তো এসেছিলেন আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করবার জন্য। আমাদের ব্যথা-কলুষ-কালিমা দূর করবেন, সেই জন্যই মায়ের জীবন এবং মায়ের বাণী আজকে আমাদের একান্ত ভাবে অনুসরণ যোগ্য এবং আমাদের বাঁচবার পথ। পরিশেষে বলি সেই আদর্শের পরাকাষ্ঠা মায়ের কাছে :

যদিও দয়া স্বামী
চাহিতে নাও জানি
তবুও দয়া করে
চরণে নিও টানি
যাহা পেলে হায়, হৃদি ভরে যায়
কণিকাটি তারি দাও হে

মায়ের কাছে এই আশীর্বাদই আমাদের একমাত্র কাম্য।

আগামী বছরে বিবেকানন্দ সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ বাঁকুড়া জেলার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে।

বিদ্যামন্দির সমাচার

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের বাস্তবায়ন 'বিদ্যামন্দির' হীরকজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল। ১৯৪১-এর ৪ জুলাই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক অনিশ্চয়তা এবং সংশয়ের বাতাবরণে। অনেক সময় চলার পথে এসেছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে বিদ্যামন্দির আপন অস্তিত্বের ছ'টি দশক সম্পূর্ণ করল। ২০০১ তাই বিদ্যামন্দিরের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ বছরটির ঘটনাপঞ্জী সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল নানা শিরোনামে।

খেলাধূলো : ২৭ জানুয়ারি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সাড়ম্বরে। প্রতিযোগিতার পুরস্কারবিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন অতীত দিনের প্রখ্যাত ক্রিকেটার সমর চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত-অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুজন প্রাক্তন ফুটবলার সুদীপ চ্যাটার্জী এবং শংকর সরকার।

এবারে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যামন্দির কর্তৃক জেলাস্তর আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্স এবং জেলা ও জোনাল স্তরে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন। এই প্রথম বিদ্যামন্দির এরকম বৃহৎ বহরের একটি ক্রীড়াযজ্ঞের আয়োজন করল। জেলাস্তর ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার ১৬ টি কলেজের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল পাঁচটি কলেজ। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান পায় যথাক্রমে শিবপুর দীনবন্ধু ইন্সটিটিউশান এবং প্রভু জগবন্ধু কলেজ।

ফেব্রুয়ারির ৫ থেকে ৯ এর মধ্যে জোনাল ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এই চারটি জোনের সেরা কলেজগুলির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চারটি কলেজ রাজ্যস্তরে আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করল। কলেজগুলি হল পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্সটিটিউশান, বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ এবং পুরুলিয়ার জে.কে. কলেজ।

২ ফেব্রুয়ারি জেলাস্তর আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্স্-এ হাওড়া জেলার ১২ টি বেসরকারি কলেজ অংশগ্রহণ করল। ৬৬ জন ছাত্র এবং ৩০ জন ছাত্রীর এই প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের অ্যাথলেটদের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিদ্যামন্দিরের রামকৃষ্ণ অধিকারী জ্যাভলিন থ্রো-এ এবং দিবাকর সাহু লং জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে। লং জাম্পে প্রসূন ব্যানার্জী অধিকার করে দ্বিতীয় স্থান।

এই ক্রীড়াযজ্ঞ সফল ভাবে আয়োজন করার ক্ষেত্রে উপাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ, বিদ্যামন্দিরের ক্রীড়া সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী তপোময়ানন্দ, অধীক্ষক। জনার্দনচৈতন্য এবং শিক্ষক সংসদের ক্রীড়া উপসমিতির কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক অমিতাভ বাগচীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেকালের বিদ্যামন্দিরের বাইরের কলেজগুলি যেমনভাবে খেলাধূলায় বিশেষত ফুটবলে অংশগ্রহণ করতে আসত, নানাকারণে এখন আর তেমনটা সম্ভব হয় না। তবুও এবারে বিদ্যামন্দিরের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের একটি টীম খেলে এল বিশ্বভারতীর উত্তর শিক্ষাসদনের ফুটবল টীমের সঙ্গে। বিগত ১অক্টোবর ২০০১। মধ্যমগ্রামের উদয়নী সংঘ নামে একটি বিশিষ্ট ফুটবল ক্লাব বিদ্যামন্দিরে খেলে গেল গত ১৪ অক্টোবর ২০০১।

এভাবে হীরকজয়ন্তী বর্ষে বাইরের ক্রীড়াজগতের সঙ্গে বিদ্যামন্দিরের ঘনিষ্ঠতর সংযোগের সুযোগ যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উৎসব-অনুষ্ঠান : জাতীয় যুবদিবস, ছাত্রদিবস, শারদোৎসব, বর্ষবরণ, রবীন্দ্রপ্রণাম, নেতাজী জন্মোৎসব, সরস্বতী পুজো, বেলুড়মঠের বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠাগুলিতে অংশগ্রহণ—ইত্যাদি নিয়মিত আয়োজনগুলি যথারীতিই হয়েছে। দু-টি বছর পরে এবার পুনর্মিলন উৎসব হৈ হৈ করে অনুষ্ঠিত হল ১২ ফেব্রুয়ারি। বর্তমান ছাত্রেরাও নানাভাবে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত থেকে আনন্দের অংশীদার হয়েছে।

এবছরের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা আয়োজিত হয়েছিল ১০ মার্চ ২০০১। সভায় সভাপতিত্ব করলেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হীরক ঘোষ। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের (পশ্চিমবঙ্গ) জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এন. কে. মৈত্র প্রধানঅতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এবারে প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনী, প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যামন্দিরের পূর্বতন অধ্যক্ষ, বর্তমানে রামকৃষ্ণ-মঠ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী।

৩০ অগস্ট অনুষ্ঠিত হল ভ্রাতৃবরণ—চিরাচরিত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে। কলকাতা দূরদর্শনের পক্ষে এই অনুষ্ঠান ক্যামেরেবন্দী করা হয়েছিল। ক্যামেরা চলছে শীর্ষক অনুষ্ঠানে উৎসবের অংশবিশেষ দেখানো হয়।

এবারে বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দিনে নাটক পরিবেশন করল বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা।

ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন দর্শন।

শোকসংবাদ : বিদ্যামন্দিরের দুজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এবছর আকস্মিক পরোলোকগমন করেছেন। প্রাক্তনী সংসদের আজীবন সদস্য বিদ্যামন্দিরের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুজিৎকুমার ঘোষ তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্র ও অনুরাগীদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন ৩০ মার্চ। বেশ কিছুদিন ভুগেছিলেন তিনি কিন্তু তাঁর আকস্মিক চলে-যাওয়া আমরা মেনে নিতে পারিনি।

এর মাত্র কয়েকদিন পরে ১৩ এপ্রিল চিরতরে চলে গেলেন দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। অবসর নিয়েছিলেন কয়েক বছর, শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। নিরভিমান, মৃদুভাষী, সুপণ্ডিত এই অধ্যাপকের চিরবিদায়ে বিদ্যামন্দির শোকস্তব্ধ।

আমরা এঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

শুধু যাওয়া আসা : বিদ্যামন্দিরে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে অধ্যাপনা করে কর্মজীবনের অনিবার্য পরিণতিতে অবসর নিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মৃণাল চক্রবর্তী। বিগত ২৯ নভেম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিদ্যামন্দিরের পক্ষ থেকে এই দুই অধ্যাপককে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হল।

প্রকৃতির রাজ্যে শূন্য থাকে না কিছুই। বেশ কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক বিদ্যামন্দিরে যোগ দিলেন। এঁরা হলেন সংস্কৃত বিভাগের অয়ন ভট্টাচার্য, পদার্থবিদ্যা বিভাগের ভবেশ রায়, বাংলা বিবাগের শাশ্বত ভট্টাচার্য এবং রসায়ন বিভাগের দেবাশিস জানা। অল্পদিনেই এঁরা বিদ্যামন্দিরের পরিবারের আপনজন হয়ে উঠেছেন।

প্রতিযোগিতায় সাফল্য : বাইরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। জাতীয় যুবদিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে উদ্বোধন, কলকাতা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন বিদ্যামন্দিরের মোট ২০ জন প্রতিযোগী। পুরস্কার পেয়েছে এর মধ্যে ১৪ জনই। ক্যুইজ-এ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান, প্রবন্ধ রচনায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান, বক্তৃতায় চতুর্থ স্থান এবং প্রশ্নোত্তর-এ প্রথম স্থান পেয়েছে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা।

১৬ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজে আয়োজিত আন্তঃ কলেজ কেমিস্ট্রি ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছেলেরা প্রথম স্থান দখল করল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদ বিষয়ক দপ্তর আমাদের কলেজকে যুব সংসদ প্রতিযোগিতার জন্যে নির্বাচিত করেন।

হীরকজয়ন্তী : ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির গত ৪ জুলাই ২০০১-এ হীরকজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল। এই বিশেষ উপলক্ষটিকে মনে রেখে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বিদ্যামন্দিরে। ২০০২ এর ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিদ্যামন্দিরে হীরকজয়ন্তী স্মারক শিক্ষা প্রদর্শনীটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। এবারের প্রদর্শনীটি হীরকজয়ন্তীর কথা বিশেষভাবে মনে রেখে বাড়তি উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় আয়োজিত হয়েছে। ২২ জানুয়ারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

এই দিনেই হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত বিদ্যামন্দির পত্রিকার বিশেষ

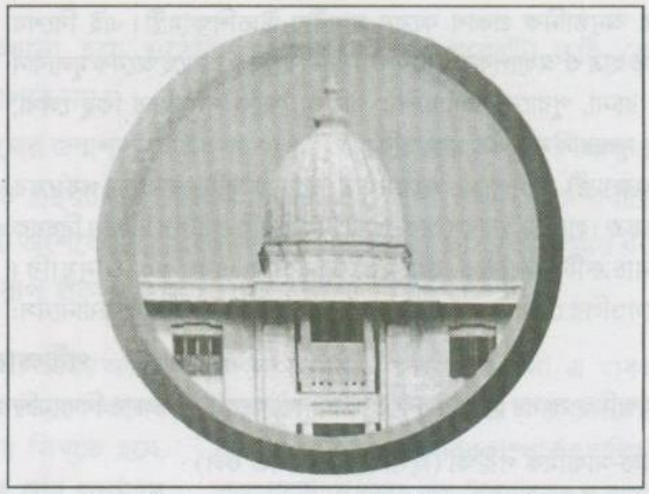

সম্ভবত বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের উদ্যোগে মঠপ্রাঙ্গণে নাট্যানুষ্ঠান এই প্রথম। উল্লেখ্য, পরিবেশিত একলব্য নাটকটির রচনা ও পরিচালনায় সুদক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছেন বিদ্যামন্দিরেরই প্রাক্তনী, বর্তমান অধীক্ষক ও অধ্যাপক ব্র. জনার্দনচৈতন্য।

আলোচনা সভা ও বক্তৃতা : বিদ্যামন্দির স্বশাসিত কলেজের মর্যাদা পাবে—এমন প্রস্তাব সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হচ্ছে। এই স্বশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্মসচিব ডঃ সুতনু ভট্টাচার্য বিদ্যামন্দিরে এসেছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য-সচিব ডঃ বি. সেনগুপ্ত ১৭ ফেব্রুয়ারি পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার নিয়ে বললেন। ২৮ এপ্রিল আয়োজিত হল বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে সমস্ত দিনের আধ্যাত্মিক আলোচনাচক্র পদার্থবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে এবং বিদ্যামন্দিরের ব্যবস্থাপনায়। ১৯ থেকে ২৯ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতির তৃতীয় গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেরও কিছু ছাত্র এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

প্রাক্তনী সংসদ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা দিলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের বাংলার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য গত ১৫ অগস্ট। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল শ্রীশ্রী মায়ের জীবন ও বাণী। ১৯ অগস্ট বিদ্যামন্দিরের কৃতী প্রাক্তনী বর্তমানে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালাজর্জ-এর ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সমীররঞ্জন মজুমদার কানাডা ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করলেন ছাত্রদের কাছে। ২৫ অগস্ট বিতর্কিত ক্লোনিং প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। বাংলা শিশু সাহিত্য নিয়ে ১ সেপ্টেম্বর সেমিনার পিরিয়ডে বললেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দূরদর্শনের সাংবাদিক স্নেহাশিস শূর সমাজ জীবনে দূরদর্শনের ভূমিকা বিষয়ে বললেন ৮ সেপ্টেম্বর সেমিনার পিরিয়ডে। ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল প্রাক্তনী সংসদ কর্তৃক আয়োজিত স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা। বললেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য। এবারে অম্বিকা সরকার ও যদুনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা দিলেন দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণকুমার গোস্বামী। বিবেকানন্দ সভাগৃহে এই বক্তৃতা আয়োজিত হল ৮ ডিসেম্বর। বিষয়

সংখ্যাটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়মিত রচনা ছাড়াও রয়েছে অনেক মূল্যবান আমন্ত্রিত রচনা, পুরানো বিদ্যামন্দির পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত কিছু লেখা, বেশ কিছু মূল্যবান নথিপত্র এবং ছবি।

হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে অয়োজিত হয়েছে দুটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনাচক্র। হান্ড্রেড ইয়ারস অব কোয়ান্টাম থিয়রি-র উপর বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হল ২৯ জানুয়ারি এবং ৩০ জানুয়ারি। কলাবিভাগগুলির যৌথ উদ্যোগে 'টুওয়ার্ডস এ ডেফিনেশন অব ইন্ডিয়ানেস: ক্রস ডিসিপ্লিনারি পার্সপেকটিভ' বিষয়ক আলোচনাচক্র আয়োজিত হল ২৫ ও২৬ ফেব্রুয়ারি।

হীরকজয়ন্তী স্মরণে আরো কিছু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেওয়া আছে যেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য।

এভাবেই বিদ্যামন্দির তার আদর্শকে অমলিন রেখে এগিয়ে চলেছে। বহিরঙ্গে পরিবর্তন এসেছে অনেক। ইন্টারমিডিয়েট আর্টস্ কলেজ হিসেবে যে কলেজের সূচনা সেই কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালু করার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হচ্ছে।

পরীক্ষার ফলাফল

উচ্চমাধ্যমিক সংসদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিদ্যামন্দির সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছে। ২০০১-এ প্রকাশিত ফলাফল :

(ক) উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা (জুলাইয়ে প্রকাশিত ফল)

শাখা	পরীক্ষার্থী	৬০% ও তার উপরে	৭৫% ও তার উপরে	৮০% ও তার উপরে	দ্বিতীয় বিভাগ	পাশ	মোট
বিজ্ঞান	৬৬	৬৫	৪১	২৪	১		৬৬
কলা	১৭	১৪			৩		১৭

সবচেয়ে বেশি নম্বর : বিজ্ঞান : অর্ঘ চৌধুরী (৮৮৭), কলা : শেখ সাবির আলি (৭১৭)

(খ) বি.এ./ বি.এস. সি পার্ট টু পরীক্ষা (৩০ অগস্ট প্রকাশিত ফল)

বিষয়	পরীক্ষার্থী	ফার্স্ট ক্লাশ	সেকেন্ড ক্লাশ	পরীক্ষা দেয়নি	সর্বোচ্চ নম্বর
১. পদার্থবিদ্যা	১৭	১৭			৬৩১
২. রসায়ন	২০	১৫	৫		৬১৫
৩. গণিত	১৫	৫	৭	৩	৬১০
৪. অর্থনীতি	১০		১০		৪৬৮
৫. ইংরাজি	২		২		৩৭৮
৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৬		৬		৪২৮
৭. ইতিহাস	৬		৬		৪০৭
৮. দর্শন	২		১		৪৬৫
৯. সংস্কৃত	৩		৩		৪৪৬

(গ) বি.এ./ বি.এস. সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা (৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত ফল)

বিষয়	পরীক্ষার্থী	ফার্স্ট ক্লাশ	৫০ থেকে ৬০ শতাংশ	৪০ থেকে ৫০ শতাংশ	৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ
১. পদার্থবিদ্যা	২৪	১৫	৭	১	১
২. রসায়ন	২৩	৯	১৩	১	
৩. গণিত	৭	৪	১		
৪. অর্থনীতি	১১	৩	৪	৩	
৫. ইংরাজি	১১		১	৭	৩
৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১			১	
৭. ইতিহাস	১১		৪	৭	
৮. দর্শন	২	১		১	
৯. সংস্কৃত	২	১	১		

সৃষ্টি: আত্মপরিচয় ও আলোচকের চোখে

পুলিন দাস

হিসেব মিলিয়ে চলা কখনো হয়ে ওঠেনি। লেখার জগতে প্রবেশটা তাই কোনো পূর্বপরিকল্পনাপ্রসূত ব্যাপার নয়।

১৯৬১ সাল। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উৎসব মুখর। আমার শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র 'রবীন্দ্রচর্চা' শীর্ষক গ্রন্থরচনায় নিরত। নির্দেশ এল তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাট্যের অপেক্ষাকৃত অল্প আলোচিত একটি অংশকে নিয়ে প্রবন্ধ রচনার। লেখা হল 'হাস্যকৌতুকময় রবীন্দ্রনাট্য প্রদেশ'। রবীন্দ্রচর্চায় তার মুদ্রিতরূপ প্রকাশ পেল।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরে পড়াচ্ছি তখন। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ একদিন ডেকে বললেন বিদ্যামন্দির পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় লিখতে হবে, রবীন্দ্রজন্মোৎসব সভায় বলতে হবে আর অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে হবে। সেদিনের রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিদ্যামন্দিরের একদা অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র। বিদ্যামন্দির পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যা অচিরেই প্রকাশ পেল। 'রবীন্দ্রনাথের গান' নামে আমার লেখাটি স্থান পেল সেখানে। এর পর থেকে বিদ্যামন্দির পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় লিখতে হয়েছে অধ্যক্ষ মহারাজের আগ্রহে সাড়া দিয়ে। বিদ্যামন্দির থেকে চলে গেছি সুদূর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেও বিদ্যামন্দির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে লিখেছি আমন্ত্রিত লেখকরূপে। 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য', 'রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচিন্তা', 'স্মৃতিবিস্মৃতি বিদ্যামন্দির' —বিদ্যামন্দির পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ পায় এসব রচনা।

প্রবন্ধ পত্রিকা রূপে 'সমকালীন' একটা সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সমকালীন সম্পাদকের নিবন্ধে পর পর অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখতে হল। সমকালীন-এ প্রকাশিত হল তারা। ইতিমধ্যে 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা' ও 'বহুরূপী' পত্রিকাতেও বেরল কিছু লেখা। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণকুমার-সরোজিনী-ইফিজিনী' শীর্ষক রচনাটিতে বাংলা নাটকের একটা বিশেষ সমস্যার ওপরে নতুন আলোকপাত ও ভ্রান্তি নিরাস লেখক-পাঠক উভয়ত বিশেষ তৃপ্তিজনক হয়েছিল। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান লিটরেচার'-পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। একটি বাংলা একাঙ্ক নাটক সংক্রান্ত আর অপরটি শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত। আমার পূজনীয় শিক্ষক অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় রাধাগোবিন্দ স্মারকসংখ্যা সম্পাদনাসূত্রে লেখা পাঠাতে বলেন। 'মধুসূদনের পত্রাবলী ও ব্রজাঙ্গনা প্রসঙ্গ' শীর্ষক লেখাটি ছাপা হয় ওই স্মরণিকায়।

চলছিল প্রবন্ধচর্চা, ইতিমধ্যে সুপ্রিয় সরকার মশাই আমার গবেষণাসন্দর্ভ মুদ্রণের আয়োজন করেন। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত হল 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটক'-এর তিনটি খণ্ড। বাংলা নাটক ও বাংলামঞ্চ এ দুয়ের আলোচনা এ যাবৎ চলেছে সমান্তরালধারায়, যদিও উভয়ে অন্যান্যভাবে সম্পর্কিত। নাটক ও মঞ্চের পারস্পরিক সম্পর্কের অম্বিত রূপটাকে তুলে ধরার যে প্রয়াস ছিল 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক'-এ বিদ্বজ্জনদের তা স্পর্শ করতে পেরেছে বলে বোধ হয়। ১৭৯৫ থেকে শুরু করে ১৯৭২-এ এসে খণ্ডত্রয়ীতে আলোচনা শেষ হয়েছে। ১৯৭২ থেকে ২০০২ অবধি কালখণ্ডের অন্তর্গত মঞ্চ ও নাটকের অনুরূপ আলোচনার ক্রমবর্ধিত চাহিদা থেকে তাই মনে হয়। আর সে চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চতুর্থ খণ্ডের খসড়া রচনায় ব্যাপৃত হতে হয়।

নাটক ও মঞ্চের আলোচনাসূত্রে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনসংক্রান্ত বেশ কিছু নথিপত্র জাতীয় মহাফেজখানা থেকে হাতে এসে গিয়েছিল। সেগুলোর সঙ্কলন বিস্তারিত ভূমিকা ও টীকাসহ 'পার্সিকিউসন্ অব ড্রামা অ্যান্ড স্টেজ' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। সেও সুপ্রিয় সরকার মশাইয়ের আগ্রহে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের প্রথম প্রকাশনারূপে বেছে নেন আমার সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিগো কমিশন'। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাবলিকেশনস ব্যুরো' তা ছেপে বার করে। 'নীলদর্পণ' পড়াতে গিয়ে আর সেই সঙ্গে নীল কমিসনের প্রতিবেদনের পর্যালোচনাসূত্রে যে সব বিরল তথ্য অধিগত হয়েছিল তা নিয়ে লেখা হলো 'নীলবৃত্তান্ত'। প্রকাশ করলেন এম.সি.সরকার। নীলকাহিনীর বাকি যে কৌতূহলোদ্দীপক অজানা ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণস্ অ্যান্ড পারিয়াস'-এর মধ্যে চাপা পড়ে আছে সম্পাদিত সেই বইটির প্রকাশও আসন্ন। অতি সম্প্রতি বইমেলার উপহারস্বরূপ এম.সি. সরকারই প্রকাশ করেছেন আমার নাট্যনিবন্ধ সঙ্কলন—'নাট্য নিরীক্ষণ: মঞ্চদর্পনে'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি রিভ্যু'-এর সম্পাদনা সূত্রে পত্রিকার পাদপূরণের দায়িত্ব প্রতিপালিত হত প্রধানত প্রবন্ধরচনা দিয়ে। গ্রন্থরচনার পাশাপাশি প্রবন্ধচর্চার ধারাটাও সফল ছিল এই পথে।

অবসরান্তে কলকাতাবাসী হওয়ায় দৈনিকপত্রিকাগুলোর সাহিত্যবাসর থেকে পুস্তক সমালোচনা লেখার অনুরোধ আসতে থাকে। সে অনুরোধ

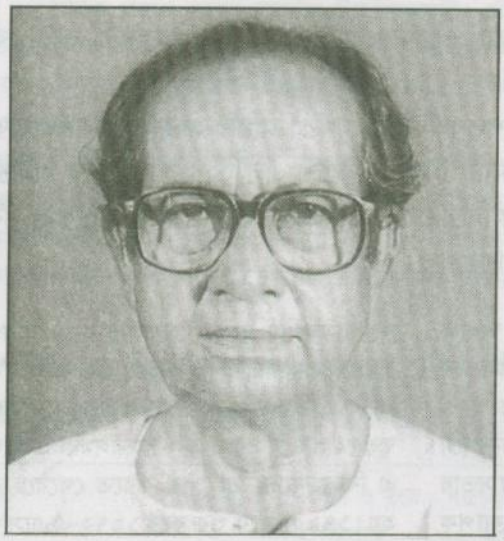

আর তার সঙ্গে লিটল্ ম্যাগাজিন-এর সম্পাদকদের আবদার, বিশেষ বিষয় কেন্দ্রিত রচনাসঙ্কলন প্রকাশের ফরমাস ইত্যাদি মেটাতে লিখে যেতে হয়। 'রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক'-এর চতুর্থ খণ্ড খসড়া আর সেই সঙ্গে 'পার্সিকিউসন অব ড্রামা অ্যান্ড স্টেজ' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জিত রূপ নির্মিতিতে চালু রাখতে হয় কলম।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শুভানুধ্যায়ীদের নির্দেশক্রমে কিছুটা যেন আকস্মিকভাবেই একদিন এই লেখার জগৎটাতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আমার ভাবনাগুলোকে ভাষায় রূপ দিয়ে পাঠককে তার অংশীদার করে নিতে চেয়েছি। ভালো মন্দ বিচারের অধিকার ধীমান পাঠকের। প্রকাশের আনন্দটুকুই শুধু আমার।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, প্রথম খণ্ড,
এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, ১৩৯০

সাজঘরে বাংলা নাটক : লেখক, পৃষ্ঠপোষক, দর্শক : কুমার রায়
আনন্দবাজার পত্রিকা পৌষ ১৩৯১

বাংলা নাটকের ইতিহাস এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সেসব রচনার স্বল্প কয়েকটি আকর গ্রন্থ হিসেবেও স্বীকৃত। স্ভাবিকভাবে মঞ্চের আলোচনার প্রসঙ্গে বাংলা নাটক এসেছে। আবার নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ ঘটেছে। কিন্তু 'পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে অঙ্কিত' ধারবাহিক ও সামগ্রিক আলোচনার অভাব বোধ থেকে আলোচিত পুস্তকের লেখক শ্রীপুলিন দাস 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক' লিখতে প্ররোচিত হয়েছেন। শুধু প্ররোচনার উত্তেজনা নয়, তিনি কাজটি করেছেন বিচার ও বিবেচনা প্রয়োগ করে। প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে একশ পঁচিশ বছরের ইতিহাস বিধৃত করেছেন তিনটি অধ্যায়ে। অধ্যায় বিভাগেও তিনি যুক্তিনিষ্ঠ। ১৭৯৫ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়। অর্থাৎ লেবেডফ-এর 'প্রক্ষিপ্ত' প্রচেষ্টা থেকে সিপাহী বিদ্রোহের 'কূলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় পর্যন্ত। এই রুশী ভদ্রলোক, সেই সময় বাঙ্গালি রুচি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশিয়ে বাঙালি থিয়েটারের কথাই ভেবেছিলেন। তবু নানা প্রতিকূলতায় এই প্রয়াস বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। অনুসৃত হওয়ার সুযোগ পেল না। আমরা ইংলিশ থিয়েটারকে বরণ করে নিলাম। সে ঘটনাও অনেক বছর পর, যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর চৌরঙ্গী থিয়েটার কিনে নিলেন(১৮৩৫)। বিলেতি থিয়েটারের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটল। বাংলা মঞ্চ হল, কিন্তু বাংলা নাটক হল না। একটি সংস্কৃত নাটক এবং বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় ছাড়া শেকসপীয়ার চর্চায় বাংলা থিয়েটার নিয়োজিত হল। এই প্রসঙ্গে লেখক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন নাট্যনির্মিতি শেকসপীয়ারের আমলের মঞ্চ ও সংস্কৃত নাট্যাদর্শ ও মঞ্চাদর্শ নিয়ে। প্রসঙ্গচ্যুত মনে হয় এই কারণে যে আমাদের এখানে সংস্কৃত নাটকের ধারাবাহিকতাই শুধু লুপ্ত নয়— সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তখন। সেই যোগসূত্রহীন অবস্থায় আমরা ইংরেজি নাট্যাদর্শকে মেনে নিয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাইভেট থিয়েটারের প্রসারের কাল। প্রসন্ন ঠাকুর প্রদর্শিত পথে বিত্তবানদের অঙ্গন মঞ্চে (ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শেই নির্মিত) নাট্যচর্চার কাল। সে চর্চায় তাঁদের বৈভব প্রকাশের প্রতিযোগিতা ছিল, নাটক নির্বাচনে তাঁদের মানসিকতা ও শ্রেণী চেতনার প্রকাশও ছিল। সেই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারতায় ঘোষণা ছিল 'নাট্যাভিনয় আনন্দ ও শিক্ষার উপকরণ।' লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই কালখণ্ডের সামাজিক, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইতিহাসকে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি একই সঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। সংরক্ষণের মনোভাব থেকে পুরোনো ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরান। রামনারায়ণ বাংলা নাটক রচনার মধ্য দিয়ে খ্যাতিলাভ করলেও তাঁর ভূমিকা এই পর্বে রাজামহারাজাদের মঞ্চের প্রয়োজনে সংস্কৃতনাটকের অনুবাদকের ভূমিকা। ব্যতিক্রম জোড়াসাঁকোর মঞ্চ— সেখানে তিনি দিয়েছেন নবনাটক। ইতিমধ্যে মধুসূদন, দীনবন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' রচনা এবং বেলগাছিয়া মঞ্চে তার অভিনয় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এই ঘটনার অভিজ্ঞতায় 'পদ্মাবতী'র সংলাপের আড়ষ্টতা মুক্ত হল, কৃত্রিমতা দূর করার সচেতন প্রয়াস দেখা গেল। এই মঞ্চ অভিজ্ঞতাই তাঁকে কৃষ্ণকুমারীর মতো নাটকে পরবর্তীকালে সাফল্য এনে দিল। জাতীয় নাটকের মান নির্ণয়ে উন্মুখ হলেন মধুসূদন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অধিকারীদের রুচি ও মানসিকতার অনুপন্থী না হওয়ায় পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী কিংবা অসাধারণ প্রহসন দুটি অভিনীত হল না। মধুসূদনের সঙ্গে মঞ্চের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন হল। বারবার এই ঘটনা ঘটেছে বাংলা নাট্য ইতিহাসে। লেবেডফ-এর বাংলা নাটক বন্ধ হয়েছিল, রামনারায়ণ সংস্কৃত নাটকে মনোযোগ দিলেন আর মধুসূদন মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। স্বাভাবিক বিবর্তনে যে বিকাশ সম্ভব ছিল তা প্রতিহত হল। তার ফল আমরা ভোগ করে আসছি।

তৃতীয় অধ্যায় বিস্তৃত হয়েছে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত। লেখক লিখেছেন, "১৯২০ অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের মঞ্চ ও নাট্যচর্চার অন্তিম অধ্যায় অবধি বর্তমান আলোচনার বিস্তার।" নিশ্চয় বাক্যটিতে বোঝাতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্রের প্রভাবের অধ্যায়, কেন না ১৯১২ সালেই গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে। এই পর্ব গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপর্ব। লেখক চিহ্নিত করেছেন,'মঞ্চবশ' নাটকের কাল। প্রতাপচাঁদ জহুরী ব্যবসাদার মানুষ। তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য ক্ষমতাবান লোক খুঁজছিলেন এবং গিরিশচন্দ্রকে পেয়েছিলেন। নাট্য সাহিত্য (?) এবং মঞ্চের ঘনিষ্ঠতার কাল। ১৮৭৬-এর আইনের জন্যই হোক কিংবা গিরিশচন্দ্রের মানসিকতার জন্যই হোক পৌরাণিক পালার মিছিল চলছিল মঞ্চে। মঞ্চের উপকরণ, অভিনেতা অভিনেত্রীদের, বিশেষ করে দর্শক সমাগমের দিকে লক্ষ্য রেখে, বাংলা নাটক একচক্ষু হরিণের মতো হয়ে উঠল। জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। যাত্রা-কথকতা ও হাফ আখড়াই-এর শ্রোতাদের গরিষ্ঠতার কথা গিরিশচন্দ্র

জানতেন। তাই থিয়েটারের কল্যাণে, তাদের কথা মনে রেখেই নাটক লিখেছেন। মধুসূদনের রচনায় যে পুরান কথা আধুনিক জীবন-চেতনায় ভাষ্য হয়ে উঠেছিল তা গিরিশচন্দ্রে রচনায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ ব্যবসাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সেটা বিচার করেছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানীর' মঞ্চসাফল্যের পর গিরিশচন্দ্র শেকসপীয়ারের নাট্যাদর্শে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন 'চণ্ড'। কিন্তু তা মঞ্চসফল হয়নি। পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গের কালে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) অসাধারণ জনপ্রিয় হল। মঞ্চ এই সুযোগ নিতে দ্বিধা করেনি। গিরিশচন্দ্রও লিখলেন সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী। যদিও শেষোক্ত নাটকটি প্রথম দুটির সমতুল নয়।

গিরিশচন্দ্রের হাত পা বাঁধা এবং ভাল নাটকের দর্শক নেই এ আক্ষেপও সত্য। কিন্তু প্রত্যাশিত বোদ্ধা দর্শক তৈরির ব্যর্থতায় তাঁর ভূমিকাও নগণ্য নয়। লেখক তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে এ প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এই কালেই অসাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাগম— গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যকার, অমর দত্তের মতো প্রযোজক নটের আবির্ভাব, একাধিক মঞ্চ এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ফলস্বরূপ—বাংলা থিয়েটারের জমজমাট কাল নিঃসন্দেহে। অজস্র নাটক লেখা হয়েছে এবং সে নাটকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে মঞ্চস্পর্শ ঘটেছে। তথাপি এ যুগ গিরিশচন্দ্রেরই যুগ। নাটকের ক্রমবিকাশের গতিধারা মঞ্চের চাহিদার টানে কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আর নাটকের বিষয়-আশয় গড়ে উঠেছে তার বিশ্লেষণে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।

নাট্য সমালোচনায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন: অশ্রুকুমার সিকদার

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি রিভিউ, ডিসেম্বর ১৯৮৫

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' লিখেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে বঙ্গীয় পাবলিক থিয়েটারের শতবার্ষিকীর সময়ে, ১৯৭২ সাল নাগাদ, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসসংক্রান্ত অনেক বই প্রকাশিত হয়। আর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অজিতকুমার ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির রচিত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সঙ্গে অন্বিত করে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ রচিত হয়নি। ডঃ পুলিন দাসের গ্রন্থটিকে সেই দিক থেকে প্রথম প্রণালীবদ্ধ উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে তিনি ১৭৯২ সালে গেরাসিম লেবেডফের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ থেকে শুরু করে শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২০ সাল পর্যন্ত, বাংলা রঙ্গ মঞ্চ ও নাটকের ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কান্বিত ইতিহাস রচনা করেছেন। দেখিয়েছেন রঙ্গমঞ্চের দাবি ও প্রয়োজন, মালিকপক্ষের উদ্দেশ্যে ও অভিনেতাদের যোগ্যতা, দর্শক সাধারণর রুচি কীভাবে নাট্যরচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই সব চাপের ব্যাপারে নাট্যকারগণের প্রক্রিয়াই বা নাটকে কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কের সূত্রটি দেখিয়েই ডঃ দাস ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন সমাজের মাত্রা। ফলে তাঁর গ্রন্থটি এই ১২৫ বছরের নাটকের ইতিহাস বোঝার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই এই গ্রন্থের পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বিশেষভাবে উন্মুখ হয়ে থাকবেন—যে দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে, শিশিরকুমারের মঞ্চ-নেতৃত্বের ফলে বাংলা নাটকের কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল তার ইতিহাস এবং গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের কথা। সর্বাধিক মূল্যবান যে বিবরণ সেখানে প্রত্যাশিত, সে হলো মঞ্চাবশ্যতার সাধারণ নিয়মকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে রচনা করলেন ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বিত করে তাঁর আধুনিক নাটকাবলী এবং গড়ে নিলেন নিজের নাটকের উপযোগী মঞ্চাদর্শ।

তিনটি মাত্র অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে লেবেডেফের প্রয়াসের কথা, কলকাতায় বিদেশী থিয়েটার, স্কুল-কলেজের অভিনয়চর্চা, বাংলা নাটকের সূচনার কতা। সূচনাপর্বে মৌলিক নাটকের অভাবে শেকস্‌পীয়ারের ও সংস্কৃত নাটকের যে-সব অনুবাদ হয়েছে তার বিবরণ পাই এবং জানতে পারি কীভাবে সমকালীন সামাজিক সমস্যাকে অবলম্বন করে মৌলিক নাটক রচনার বীজ রোপিত হয়। লেখক দেখিয়েছেন, বাংলা নাটক কীভাবে শেক্‌সপীয়র, সংস্কৃত ও নাটক ও বাঙালীর যাত্রাপালার ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে প্রথম কুণ্ঠিত পদক্ষেপ দিয়েছিল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "বাঙালীর মঞ্চপ্রয়াসের এই সূচনাপর্বে কেন প্রাচীন ভারতীয় মঞ্চরূপে অনুবর্তন ঘটল না?" কিন্তু তাঁর আলোচনায় কোনো সদুত্তর পাই না। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় লেখক কোনো নূতন তথ্য বিশ্লেষণের অবতারণা করে নি। ডঃ দাস তথ্যসমাবেশে ও বিশ্লেষণের মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে, অর্থাৎ মধুসূদন থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটকের আলোচনায়। এই চমৎকার আলোচনায় নাটকের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ, মঞ্চকর্তৃপক্ষের সমাজিক সমস্যা ও আন্দোলনকে লেখক অত্যন্ত নিপুণতায় কার্যকর বিশ্লেষণ, মঞ্চকর্তৃপক্ষের চাহিদা এবং সমকালীন সামজিক সমস্যা ও আন্দোলনকে লেখক অত্যন্ত নিপুণতায় কার্যকারণসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলালের আলোচনা তুলনায় ততো আকর্ষক হয়ে ওঠেনি। মাত্র দুই পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ উপসংহার গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করেছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থবদ্ধ সমস্ত যুক্তিশীল সিদ্ধান্তকে এখানে সবিস্তারে উত্থাপন করা প্রয়োজন ছিল।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রাসাদমঞ্চে 'ঈঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়' নাট্যাভিনয় হত। কিন্তু খ্রীস্টীয় যাজকদের ধর্মান্তরীকরণ প্রয়াসে ইংরেজ শাসকেরা মৌন প্রশ্রয় দিলে প্রতিক্রিয়াশীল-প্রগতিপন্থী নির্বিশেষে তার প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েছেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে রামমোহন অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের চর্চায় বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ ঘটায় বাংলা নাটকাভিনয়ের দিকে প্রবণতা বেড়ে গেল। প্রাসাদমঞ্চের মালিক রক্ষণশীল ভূম্যধিকারীদের বিরূপতায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণকারী উমেশচন্দ্রের 'বিধবা বিবাহ', রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' মধুসূদনের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক অভিনীত হতে বারবার বাধা পেয়েছে। কেন এই সময় বাংলা নাটকের অভিনয়-প্রয়াসীরা সংস্কৃত নাটকের বাংলা রূপান্তরের দিকে বেশি উৎসাহী হলেন তার সামাজিক ব্যাখ্যাও আমরা পেয়ে যাই। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় অবধি মোটামুটিভাবে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতারই যুগ। কিন্তু তলে-তলে ইংরেজ ও এদেশবাসীর স্বার্থর সংঘাতও ঘটতে থাকে। ১৮৩৬ সালের একাদশ আইনের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও 'ভারতবর্ষীয় সভা' সংগঠিত হওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। সাধারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁর দলমতের পার্থক্যজনিত অন্তর্বিরোধকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। বিতর্কিত সামাজিক সমস্যার মূলক নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার অর্থই হলো সেই বিরোদকে উসকে দেওয়া। সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক নাটকে সেই আশঙ্কা ছিল বলেই হিন্দু জমিদারের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মঞ্চায়নে তাঁদের মঞ্চপ্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। শুধুমাত্র ঐশ্বর্যপ্রদর্শনের সহায়ক ছিল বলে সংস্কৃত নাটকে অভিনয়ে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন একথা, তাহলে, মনে করা ভুল হবে।

মধুসূদনকেও বেলগাছিয়য়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের রুচি-আগ্রহের কথা, সেখানকার অভিনেতাদের সংখ্যা ও অভিনয়-সামর্থের কথা মনে রেখে অগ্রসর হতে হয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন স্বাধীন, নাটকের ক্ষেত্রে তাঁকে মঞ্চবশ হয়ে কাজ করতে হয়েছে। তবে 'পদ্মাবতী'তে বিদেশী কাহিনীর প্রভাব আছে বলে, বা এই নাটকে পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্রে অবনমন ঘটানো হয়েছে বলে সেই নাটককে মঞ্চস্থ হতে দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এই অনুমানের সমর্থনে লেখক বিশেষ কোনো তথ্য দেননি।

অন্তিম লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতালাভ, কিন্তু আপাতত জাতীয় ভাবোদ্দীপনা-সঞ্চার ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য। হিন্দুমেলার এই আদর্শের সঙ্গে মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটকে প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের জয়গান কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ একথা ডঃ দাস নিপুণতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পশ্চিমী নাটকের আঙ্গিককেও পরিহার করে তিনি যে জাতীয় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন, তারও কারণ নিহিত আছে হিন্দুমেলার আন্দোলনের মধ্যে। ধনীদের প্রাসাদমঞ্চের গণতন্ত্রীকরণে মনোমোহনের উদ্যোগের দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মঞ্চের গণতন্ত্রীকরণের পিছনে সেদিনের নবোদ্ভূত ও ক্রমবর্ধমান নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । শুধু প্রমোদবিতরণের মাধ্যম হিশাবে নয়, মঞ্চকে সমাজ-সংস্কারের অস্ত্র হিশাবে ও তাদের বিকাশোন্মুখ রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশের বাহন হিশাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রাসাদমঞ্চে সে সুযোগ ছিল না। সেই প্রয়োজনবোধ থেকে জন্ম নিল ১৮৭২ সালে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়— ন্যাশনাল থিয়েটার, যার প্রতিষ্ঠায় পিছন থেকে উৎসাহ জাগিয়ে ছিলেন হিন্দুমেলার সংগঠক নবগোপাল মিত্রের মতো মানুষ। ন্যাশনালের যাত্রা শুরু হয়েছিল 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় দিয়ে, শেষ হলো 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দিয়ে। এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মঞ্চের গণতণন্ত্রীকরণ না হলে এই ঘটনা ঘটতে পারতো না। হিন্দুমেলা যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটক লিখেছিলেন। পরে গ্রীক বা মুসলমান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে হিন্দুর স্বাদেশকতাপূর্ণ বীরত্বের কাহিনী খোলস ত্যাগ করে ১৮৭৬ সাল নাগাদ মঞ্চ ও নাটক সরাসরিভাবে ইংরেজ শাসকের বিরোধিতা শুরু করে। ঐ বছরে অভিনীত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', মঞ্চস্থ হয় 'গজানন্দ ও যুবরাজ' এবং 'হীরকচূর্ণ' প্রহসন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে লর্ড নর্থব্রুক নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। এই আইনের পটভূমিকার বিস্তারিত পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

এই নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারি ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ধনী ব্যবসায়ীর কবলস্থ হওয়া , এই দুটি ঘটনা যে বাংলা নাটকে কতটা সদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তা লেখকের আলোচনার অনুসরণে উপলব্ধি করা যায়। নাট্য নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হওয়ায় মঞ্চজগতে যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় তারই সুযোগে প্রতাপচাঁদ জহুরী, গুর্মুখ রায়ের মতো অবাঙালী ব্যবসায়ীরা নিতান্ত লাভালাভের দিকে দৃষ্টি রেখে মঞ্চব্যবসায়ে এগিয়ে আসেন। একদিকে নিষেধমূলক আইনের খড়্গ, অন্যদিকে বক্স-অফিসের হাতছানিতে মঞ্চস্থ হতে থাকলো নৃত্যগীতের পসরা সাজানো গীতিনাট্য, জনপ্রিয় উপন্যাস বা কাব্যের নাট্যরূপ। মনোমোহনের হাতে যে পৌরাণিক নাট্যচর্চা পরবর্তীকালে, বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রর হাতে, আরো প্রবল হয়ে ওঠে নাট্য নিয়ন্ত্রন আইনের পরোক্ষ প্রশ্রয় ও হিন্দু পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষ প্রেরণায়। যাত্রাধর্মী অনুষ্ঠানের উপর এই আইন প্রযোজ্য নয়, আইনটির এই শেষ ধারা পৌরাণিক নাট্যরচনায় উৎসাহ জুগিয়েছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইন, ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করার আইন, ইলবার্ট বিল্ নিয়ে যখন দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা, তখন সংঘাতের সেইসব ক্ষেত্রকে সচেতনভাবে এড়িয়ে ব্যবসায়ী মঞ্চ-কর্তৃপক্ষ নাটকের জন্য বেছে নিল বর্তমানকাল থেকে সুদূর পৌরাণিক প্রসঙ্গ। আর তাত্ত্বিক প্রেরণা জোগাল বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, দয়ানন্দ সরস্বতী, কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কার্য কলাপে পুষ্ট হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ, সবার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রামকৃষ্ণ। উনিশ শতকের আটের দশকের গোড়ায় ছিল এই হিন্দু পুনরুভ্যুত্থানের মাহেন্দ্রক্ষণ, আর গিরিশচন্দ্রের ব্যাপক মঞ্চ ও নাট্য চর্চার সূচনাকালও ছিল এই সময়। 'ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম—ধর্ম' সুতরাং তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে যাত্রাধর্মী নাটকাবলী লিখে চললেন। আর এইসব পরমার্থিক তাত্ত্বিক কারণের সঙ্গে মিশে থাকলো নিতান্ত আর্থিক চিন্তা—"দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে গেলে পৌরাণিক নাটক ছাড়া আর উপায় কি?" বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরে যখন দেশপ্রেমের আবেগ ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়, তখন সেই আবেগের পুষ্টির প্রত্যাশা পূরণ করতে নাটক ও মঞ্চকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল অনিবার্যভাবে। পুরাণাশ্রয়ী ভক্তিবাদের সাধনা ছেড়ে নাটক ও মঞ্চে আবার ইতিহাসচর্চার ধারা পুনরায় লক্ষ্য করা গেল গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। গিরিশচন্দ্র বেশ অভিনবত্ব ও দর্শক-মানসিকতা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীর কাসিম' নাটকে— ইংরেজের সঙ্গে বাঙালী রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ সংঘাতের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার সুযোগ নিয়েছেন, এমন বিষয় নির্বাচন করেছেন যা হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য হয়ে তাদের মিলনের পথকে প্রশস্ত করতে পারে। প্রশ্ন হলো, যে গিরিশচন্দ্র ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর জন্য পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তিনি কেন এই পর্বে এইসব সংঘাতের সম্ভাবনাপূর্ণ নাটক লিখতে গেলেন? মনে রাখতে হবে তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' অচিরেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। ব্যবসায়ী মঞ্চকর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রশ্রয় দিলে কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর লেখকের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। সে যাই হোক, গিরিশচন্দ্রে কৃপায় জনপ্রিয়তা লাভ করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ রক্ষা পেল ঠিকই, কিছু মূল্যও দিতে হলো মঞ্চ ও নাটককে। নাটক ও মঞ্চ হয়ে উঠলো একান্তভাবে দর্শকনির্ভর। কারণ গিরিশচন্দ্র যখন মঞ্চজীবীরূপে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন তখন গণতান্ত্রিক চেহারা হারিয়ে বাংলা বঞ্চ ব্যবসায়ীর মালিকাধীনে এসে গিয়েছিল। মঞ্চের, ফলে নাটকের, গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল সেদিন। গিরিশচন্দ্রকে ব্যবসায়ী মঞ্চের লাভ লোকসানের দিকে সব-সময় নজর রাখতে হয়েছিল। পরে নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নাট্যরচনার সুপ্ত আকাঙ্খাকে সব-সময় তাৎক্ষণিক মঞ্চ সাফল্যের কাছে বিসর্জন দিতে হয়েছে। এও এক 'বলিদান' । এই সমস্ত বিষয়, ও আরো অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় ডঃ দাস তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থে সমাজ সচেতন বিশ্লেষণের সঙ্গে উপস্থিত করে নাট্য সমালোচনায় নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। এই গ্রন্থে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার। প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তর্গত কালপর্বের রচিত নাটক ও নাট্যকার অভিনীত নাটক, সেই নাটকের অভিনয়স্থান ও তারিখের এক প্রায়-পূর্ণাঙ্গ কালানুক্রমিক পঞ্জী তিনি তিনটি পরিশিষ্টে বহু যত্নে যোগ করে দিয়েছেন বলে গ্রন্থটি সর্বদা ব্যবহার্য রেফারেন্স গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। দীর্ঘ দিনের নিরলস ও একাগ্র শ্রমশীলতা ব্যতিরেকে যে এমন তথ্য যুক্তসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করা যায় না তা নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই বুঝবেন।

দু-একটি দুর্বলতার কথা বলা প্রয়োজন বোধকরি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক যে ভারতীয় বেশে রাসিনের 'ইকিজিনি'-র অনুবাদ একথা লেখক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যদিও, তবু এই বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থের মূল আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। এই কাজে তিনি কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যয়ের লোভ সংবরণ করলেই পারতেন, বিশেষত যখন এই বিষয়ে ডঃ দাসের প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'-য় প্রকাশিত হয়েছে। দু-একটি বিরলক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করতে ভুল হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটির প্রধান দুর্বলতা রচনাগত নয়, প্রকাশনাগত। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য সরকারি অনুদান অপাত্রে বর্ষিত হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান যোগ্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারি অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা বইটি যৎপরোনাস্তি অযত্নের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মলাট যে কোনো সময় খসে যাবে, কাগজ ও ছাপা বেশ খারাপ। দুই পৃষ্ঠাব্যাপী শুদ্ধিপত্রের বাইরেও অনেক ছাপার ভুলে মূল্যবান বইটি কণ্টকিত। মুদ্রণের এমনই অবস্থা য়ে মলাটে লেখকের পদবী ছাপা হয়েছে 'দাস', কিন্তু আখ্যাপত্রে ও ভূমিকার নিচে ছাপা হয়েছে 'দাশ'। তবে এইসব বহিরঙ্গ কারণে পাঠক যদি বইটি বিষয়ে বিমুখ হন, তাহলে ক্ষতি পাঠকেরই। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশক যত্ন নিলে সুখী হবো। আরো আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডটি অচিরে প্রকাশিত হবে এবং সেই প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে সযত্ন-প্রকাশনার চিহ্ন।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ

এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৯০ ও ১৩৯৮

বাংলা নাটক, বাংলা মঞ্চ: স্বপন চক্রবর্তী

বসুমতী, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত এবং বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বিবরণ ও নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে আলাদাভাবে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু প্রবন্ধ থাকলেও এই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত বিষয় দুইটির ধারাবাহিক ও সামগ্রিক আলোচনার অভিনব এবং সার্থক প্রয়াস— অধ্যাপক পুলিন দাস রচিত গ্রন্থ—"বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চ ও বাংলা নাটক" (১ম,২য়)। "রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চা যেহেতু প্রচলিত মঞ্চপ্রয়াসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অন্বিত নয় সে জন্য সময়ের দিক থেকে প্রামাণিক হলেও রবীন্দ্রনাটক ও মঞ্চ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই বিবেচ্য"— লেখকের এই বক্তব্য সমর্থন করে বলা যায় লেখক রচিত, "মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ" এই পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ।

দুই খণ্ডে প্রকাশিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক গ্রন্থে সমগ্র আলোচ্য বিষয় কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত। প্রথম খণ্ডে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডফ-এর নাট্যপ্রয়াসকে বাংলা নাটকের আদি উপস্থাপনরূপে গণ্য করে আলোচনার ব্যাপ্তি গিরিশ নাট্যচর্চার অন্তিম লগ্ন (১৯২০সাল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৯২১ সালে কর্নওয়ালিশ মঞ্চে আলমগীর নাটকের নাম ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ীর আবির্ভাব ও তাঁর জয় যাত্রা থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালে বাংলার সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষের আলোকপাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার পরিসমাপ্তি।

১৭৯৫ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে, নাটকের আদিকথন, নাট্যরচনা, প্রযোজনা, মঞ্চের বিবর্তন এবং নাটক রচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে, সামাজিক দায়, লোকরঞ্জন, রাজশাসন, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় কালানুক্রমে অতি নিপুণভাবে এই গ্রন্থত্রয়ে বর্ণিত। আলোচিত বিষয়গুলি উদ্ধৃতিবহুল হলেও, প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃতির নির্দেশিকা পাঠকের জানবার স্পৃহা বাড়ায়। পরিশিষ্ট অংশগুলি প্রভূত যত্ন সম্বলিত নির্ঘণ্টপঞ্জী উৎসাহী পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও নাট্যকর্মী—সকলেরই শ্রম লাঘব এবং চাহিদা পূরণ করবে। মূলত এই গ্রন্থত্রয় বাংলা সাহিত্যের বিপুল ও বর্ণময় সম্ভার থেকে চয়নিত নানা বর্ণের একখানি মালা।

দেশীয় মঞ্চচর্চার সূত্রপাতে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে "বিদ্যাসুন্দর" নাটকের অভিনয়(১৮৩৫) প্রাচ্যরীতির সঙ্গে ইউরোপীয় মঞ্চরীতির অনুসরণ আদি বাংলা নাটকদ্বয় "কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুন" রচনার পশ্চাদপট বিশ্লেষণ, প্রথম মঞ্চায়িত মৌলিক বাংলা নাটক "কুলীনকুল সর্বস্ব"র নাট্যরীতি বাংলা নাটকের আদি পর্বের অবশ্য জ্ঞাতব্য এই বিষয়গুলি সুআলোচিত। আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং আদর্শগত ভাবনার আলোকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের গতিপ্রকৃতি লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, যেমন ১৮৩১ সালে প্রসন্ন ঠাকুর কর্তৃক দেশীয় নাট্যশালার ভাবনা, একই সঙ্গে ঐ সময়কালে (ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত) বাংলা মঞ্চে বিশেষ মানসিকতার কারণে তৎকালীন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে মঞ্চে সংযোগস্থাপন না হওয়া, ফলে 'বিধবা বিবাহ' নাটক মঞ্চস্থ না করতে দেওয়া ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে—মধুসূদনের নাটক কৃষ্ণকুমারীর মঞ্চ সফলতা ও তার কারণ, দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ঘনিষ্ঠ নাট্যপ্রয়াসে তৎকালীন মঞ্চের অসহযোগ (বড়লোকের প্রাসাদমঞ্চে নীলদর্পণ-এর অভিনয় ব্যবস্থার প্রশ্নই ওঠে না।) তারপর সুদীর্ঘ১২ বৎসর অপেক্ষার পর ১৮৭২ সালে মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর উঠোনের মঞ্চে নীলদর্পণের অভিনয়-এর মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অভ্যুদয়, হিন্দুমেলায় অনুপ্রাণিত হয়ে মঞ্চে ও নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটক ও তা মঞ্চায়ন প্রভৃতি বিষয় মননশীলতায় বিশ্লেষিত।

পাশাপাশি তৎকালীন মঞ্চ প্রযোজনার খুঁটিনাটি বিষয় উপস্থিত— দুর্গেশনন্দিনী নাটকে মঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে নায়কের প্রবেশ বা সরোজিনী নাটকে রাজপুত রমণীদের চিতারোহণ বর্ণনা— যথা "তখন তো বিদ্যুতের আলো ছিল না, স্টেজের উপর ৪-৫ ফুটের লম্বা টিন পেতে তার উপর সরু সরু করে কাঠ জেলে দেওয়া হত...রাজপুত রমণীরা গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পড়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনেই কেরোসিন ছিটিয়ে দেওয়া..." পাঠকের মানসপটে ঐ অভিনয়ের স্থায়ী চিত্র এঁকে দেয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকের সঙ্গে রাসিনের ইকিজিনি নাটকের সুদীর্ঘ আলোচনা বা তুলনা মূলগ্রন্থের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলা যেতে পারে।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও তার ফলাফল প্রসঙ্গে লেখকের সঠিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে পরম সম্পদ। "ইংরেজের শাসনাধীনে থেকেই সর্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব, এ বিশ্বাসের উপর ভর যত দিন ছিল ততক্ষণ প্রতিবাদ চলেছে প্রধানত সামাজিক কুপ্রথার বন্ধনের বিরুদ্ধে... মোহ ভাঙতে দেরী হয়নি— ১৮৭২ সলের পর যে সব নাটক অভিনীত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতীয় মুক্তিবাসনার রূপায়ণে প্রয়াসী... ইংরেজ শাসনের ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্নমনস্ক করে তুলেছে দর্শকদের... শাসকগোষ্ঠির আতঙ্কিত হবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট

ছিল... ।" লেখক তাঁর এই বক্তব্যকে যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন গবেষণার মাধ্যমে—'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের বিরুদ্ধে মনগড়া অশ্লীলতার মামলা, মামলার রায়দানের সঙ্গে সঙ্গে (আপীল করবার আগেই) "চা-কর দর্পণ" মঞ্চায়িত রোধ করবার প্রয়াসে "নাট্যনিয়ন্ত্রণ" আইন পাশ করিয়ে নেওয়া (১৮৭৬) এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর করা, নাটকের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন প্রভৃতি লেখকের মন্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এই নাট্য আইন প্রণয়নের দরুণ মঞ্চে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল এবং সেই অনিশ্চয়তার সুযোগে ধনী ব্যবসায়ী মহলের লাভের আশা নিয়ে মঞ্চে বিনিয়োগ এবং ফলস্বরূপ বাংলা মঞ্চের চরিত্রের গুরুতর পরিবর্তন, তারও বিস্তৃত আলোচনা লেখক করেছেন গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয় থেকে তাঁর অন্তিম পর্ব পর্যন্ত। এই আলোচনায় স্থান পেয়েছেন ডি এল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সমসাময়িক সকল নাট্যকার ও মঞ্চাভিনীত নাটক সকল। রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভার বিকাশও এই সময়ে, তবুও রবীন্দ্রনাথ ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছেন অন্যগ্রন্থে।

এই পর্বে রচিত নাটক ও মিনার্ভা, ন্যাশনার, বেঙ্গল থিয়েটার, এমারেল্ড (পরে ক্লাসিক) থিয়েটার প্রভৃতি মঞ্চে অভিনীত পৌরাণিক ও সামাজিক ও কিছু ঐতিহাসিক নাটক বিশ্লেষণ করে লেখক একটা নির্মম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন— "পরাধীনতার ভীষণ মূর্তি, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের আভাতে সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি হল। নাটক ও মঞ্চের পক্ষে সেদিন আইনের চোখে নির্দোষ নাচগান আর আলোর রোশনাই জ্বালিয়ে দর্শক তোষণ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।" শুধু তাই নয়, যেদিন যে নাট্যকার ও পরিচালকবৃন্দের এই একই কারণে মঞ্চ ও অভিনোদের সঙ্গে আপস করতে হয়েছিল, এই নির্মম সত্যও লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

১৯২১ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব নাট্য প্রযোজনার সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে এবং বৈচিত্র্য মঞ্চচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ সাহিত্যের সান্নিধ্য, পৌরাণিক পালার নব উন্মেষ, ঐতিহাসিক নাটকের পুনঃপ্রবর্তনের বিস্তারিত বিবরণের পাশাপাশি ১৯২৫ সলে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন এবং ছাত্র ও যুব রাজনীতিতে বাম চিন্তাধারার উন্মেষের পটভূমিকায় নাটক মঞ্চায়নের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ, অবশেষে ১৯৪৪ সালে নবান্নের অভিনয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অত্যাচার, শোষণ ও দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর বাস্তবরূপের মঞ্চে প্রতিফলনও স্পষ্টভাবে বিবৃত। আবার একই সঙ্গে ঐ পর্বে অন্যান্য নাট্যকারের নাটক ও তার মঞ্চায়ন, মঞ্চের বিবর্তন, ১৯৩১২ সলে সতু সেনের পরিচালনায় "ঝড়ের রাতে" নাটকে নির্দিষ্ট সময় বাংলা নাটকের অভিনয়কে বেঁধে ফেলা, মঞ্চস্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিকের উপস্থাপন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সুআলোচিত।

১৯৪৪ সালের পরে থেকে গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য-নাটকের বিকাশ ও বৈশিষ্ট, ফ্যাসি-বিরোধি লেখক সঙ্ঘঠন। বহুরূপীর রবীন্দ্র নাটক অভিনয়, অন্য গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ের ধারা, বাংলা মঞ্চে অনুবাদ নাটকের জোয়ার, মহাপুরুষের জীবনাশ্রয়ী নাটক প্রভৃতি ঘটনা যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এমনকি ডি এল রায়ের "পাষাণী" নাটকের মঞ্চ অসফলতার কারণ ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিতে ব্যখ্যাত।

রবীন্দ্র-নাটক ও তার মঞ্চায়ন বিষয়ে প্রকাশিত আলাদা গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারিবারিক মঞ্চ, সৌখিন নাট্যদল ও ব্যবসায়িক মঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের বিস্তৃত বিবরণ ছাড়াও, নানাভাবে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাটকের বিবর্তনের ইতিহাস রবীন্দ্রানুরাগী পাঠককে আগ্রহী করে তুলবে। এই পর্বে, রাজ ও রানী নাটকের ভৈরবের বলি হয়ে তপতীতে রূপান্তর থেকে শুরু করে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়ের জন্য গোড়ায় গলদকে শেষরক্ষা রাজা থেকে অরূপরতন, অচলায়তন থেকে শুরু এবং পরিশোধের শ্যামায় রূপান্তরের কাহিনী, ও তার বিশ্লেষণ, অথবা যক্ষপুরী নাটকে বারংবার রঙ তুলি বুলিয়ে কেমন করে তা নন্দিনী থেকে রক্তকরবী হয়ে ফুটে উঠল তার কাহিনীও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। অপরপক্ষে, মঞ্চায়নের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিবর্তিত বিভিন্ন নাটকের ভিন্ন ভিন্ন প্রযোজনার স্টেজ কপির বিবরণ, মঞ্চের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও রবীন্দ্রনাটক মঞ্চায়নে মঞ্চশিক্ষা ও আঙ্গিক বিপ্লবের ইঙ্গত লেখক প্রকাশ করেছেন— বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দৃশ্য পরিবর্তনকালে চিত্রপট ওঠানো নামানোতে রবীন্দ্রনাথের যে অনীহা ছিল, বিসর্জন নাটকের স্টেজ কপিতে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা নির্দেশ মাধ্যমে (ড্রপ কোট ডার্ক বা আলোর ব্যবহার সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি ইত্যাদি) তা সুনিপুনভাবে প্রমাণ করেছেন।

আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে, প্যারিসের পতন (১৪.৬.১৯৪০) প্রাক্ রাত্রে ফরাসী রেডিওতে "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়, তার পারিপার্শ্বিকতা, রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির যথাযথ বর্ণনার উল্লেখ পাঠক-মনকে আপ্লুত করে।

প্রতিটি গ্রন্থে সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র সমেত আরও মুদ্রণ প্রমাদের কথা লেখক স্বীকার করে নিলেও অসংখ্য বানান ভুল পীড়াদায়ক। এবং বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক ও সাহিত্য প্রচ্ছন্নভাবে যে তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার বিবরণ ও সবিশেষ বিশ্লেষণ এই গ্রন্থত্রয়ে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্র-নাট্য বিষয়ক গ্রন্থে যে চিত্রমালা মুদ্রিত হয়েছে তার ব্লক, মুদ্রণ ও কাগজ অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় আমরা গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত রক্তকরবী অভিনয়ের কল্পিতরূপ বা নন্দলাল বসু অঙ্কিত মঞ্চরূপ যথাযথ অবলোকন থেকে বঞ্চিত হলাম। পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রাকর এ বিষয়ে যত্নবান হলে লেখক ও পাঠক উভয়েই উপকৃত হবেন।

নীলবৃত্তান্ত: এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স,১৪০৫

নীলবৃত্তান্ত এভাবে আর কখনও উঠে আসেনি: অলোক রায়

১এপ্রিল ২০০০ আজকাল

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারখার। আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে ভারতবর্ষে নীলচাষের শুরু মনে করা হয়। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলায় ব্যাপকভাবে নীলের চাষ, নীলকুঠি এবং নীলের ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করে। ছয়ের দশকে নীলকরদের অত্যাচার দুর্বিষহ হয়ে উঠলে চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সিপাহি বিদ্রোহের পরে নীলবিদ্রোহ ইংরেজ শাসকদের কিছুটা সন্ত্রস্ত করে তোলে, ফলে তারা উভয়কুল রক্ষা করে এক দিকে 'মুগুরের আইন' (Act XI of 1860) প্রবর্তন করেন, অন্যদিকে সুবিচারের আশ্বাস দিয়ে নীল কমিশন গঠন করেন। নীলচাষ এবং নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে জানার জন্য নীল কমিশনের রিপোর্ট শুধু মূল্যবান নয়, অপরিহার্য। সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও ড. পুলিন দাস ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন নীলচাষের ইতিহাস এবং সে সময়ের সমাজ-অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৮৬০ সালের রিপোর্ট অফ ইন্ডিগো কমিশন তাঁর সম্পাদনায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে আগেই প্রকাশিত হয়েছে (১৯৯২)। দীর্ঘ ভূমিকা সংবলিত অত্যন্ত সুসম্পাদিত গ্রন্থ, দীর্ঘদিন গবেষক, এমনকি সাহিত্যের ছাত্রেরও নিত্যব্যবহার্য গ্রন্থ বলে পরিগণিত হবে। সরকারি আনুকূল্য থাকলে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র রিপোর্টটি প্রকাশ করতে পারতেন (বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারি আনুকূল্যেই টিকে আছে), আপাতত তাঁর সাক্ষ্যবিবরণের অংশ বাদ দিয়ে (কারও মনে হতে পারে সেই অংশটিই বেশি জরুরি) শুধু রিপোর্ট, সাক্ষীদের নামের তালিকা এবং পরিশিষ্ট অংশ ছেপেছেন। সাহিত্যের ছাত্রকেও *নীলদর্পণ* নাটক পড়তে হলে শুধু কাহিনীর পটভূমি নয়, নাটকের প্রধান ঘটনা ও চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিতটুকু জানা থাকা দরকার। কলেজের ছাত্ররা হয়ত নীল কমিশনের রিপোর্ট পড়বে না, কিন্তু তাদের মাস্টারমশাইরা অবশ্যই পড়বেন। এতদিন যা ছিল দুর্লভ ও প্রায়-দুষ্প্রাপ্য, ড. পুলিন দাস তা আমাদের হাতে এনে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। গত কয়েক বছরের বাংলা ভূমিব্যবস্থা ও কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে নীল আন্দোলন নিয়ে লেখা ব্লেয়ার বি ক্লিঙের *ব্লু মিউটিনি*, তপোবিজয় ঘোষের *নীল-আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র এবং নীলবিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালি-বুদ্ধিজীবী* বইগুলি তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মূল্যবান। তবে মার্কিন ঐতিহাসিকের রচনা গবেষণা-পদ্ধতির নিদর্শন হিসেবে প্রশংসনীয় হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সর্বদা ঐক্যমত্য পোষণ করি না। অকালপ্রয়াত তপোবিজয়ের নীল-আন্দোলন সম্বন্ধে পরিকল্পিত বইয়ের চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না, তবে যে দুটি খণ্ড আমরা দেখেছি তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু নীলচাষের সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এদিক থেকে ড. পুলিন দাসের *নীলবৃত্তান্ত* (১৪০৫) বইয়ের পাঁচটি পরিচ্ছেদে নীলচাষ ও নীলের ব্যবসা, নীলবিদ্রোহ, বিদ্রোহের সমর্থক সহযোগী বাঙালী জমিদার ও বুদ্ধিজীবী এবং বিদেশি শাসক ও সওদাগরের ভূমিকা, সবশেষে সাহিত্যে ও ইতিবৃত্তে নীলের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে নীল কমিশন গঠনের সময়ে প্রবর্তিত একাদশ আইনের বারোটি ধারা, *নীলদর্পণ*-এর ইংরেজি অনুবাদের রেভারেন্ড জেমস লঙ্ লিখিত ভূমিকা এবং হরমণিহরণ ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট। অল্প পরিসরে (১৩০পৃষ্ঠা) এদেশে নীলচাষ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এত তথ্য এমন সুবিন্যস্ত ভাবে পরিবেশিত হতে ইংরেজি বা বাংলা কোনও বইতে দেখা যায় না।

ড. পুলিন দাসের *নীলবৃত্তান্ত* নীলচাষের ইতিহাস হিসাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বই। আমাদের জানা অবং অজানা বহু তথ্যের এখানে সমাবেশ হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচার যে কতভাবে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল তা সমসাময়িক বিভিন্ন রচনা থেকে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে। বাঙালী কৃষক দীর্ঘদিন ধরে ভূস্বামীর অত্যাচার নীরবে নিভৃতে সহ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু অত্যাচার এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যখন চাষীরা আর সহ্য করতে না পেরে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকেই নীলবিদ্রোহ বলা হয়। প্রথমদিকে জমিদারের স্বার্থের সঙ্গে নীলকরদের স্বার্থের ঐক্যবন্ধন ঘটে। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর নীলচাষের শুধু সমর্থন করেননি। তাঁর নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধেও কিছুটা তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। ভূস্বামীদের সংগঠনও নীলচাষের বিপদের কথা ভেবে দেখেননি। কিন্তু পরে 'জমিদাররাই নীলকরদের দ্বারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাঁদের স্বার্থহানির ফলস্বরূপ ক্রমশ নীলকরবিরোধী হয়ে উঠেছেন। অবশেষে জমিদাররা প্রজাপক্ষের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে।' (পৃ ৩৯)। ইংরেজ শাসকেরাও অনেকদিন পর্যন্ত নীলকর সাহেবদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তবে সিপাহি বিদ্রোহের করুণ অভিজ্ঞতার অব্যবহিত পরেই ব্যাপক প্রজাবিদ্রোহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থেই বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয় প্রশাসন।... শোষণচক্রের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে এক হয়ে গেছে শিল্পপুঁজি আর বাণিজ্যপুঁজি-শাসক ও সওদাগর। (পৃ ৯৫)। মিশনারি সাহেবদের ধর্ম প্রচারের কাজে নীলকর সাহেবরা বাধা সৃষ্টি করায় তাঁরও প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করতে বাধ্য হন। অন্য দিকে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের কথাও তাঁরা ভেবেছেন। এর মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন সংবাদপত্রসেবীর ভূমিকা ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। ইংরেজশাসন কাম্য বিবেচনা করলেও শাসকদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের তাঁরা সমালোচনা করেছেন। হরিশচন্দ্র শুধু সেখানে থেমে যাননি। তিনি নিজের শ্রম শক্তি অর্থ সময় দিয়ে দুর্গত চাষীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং আদর্শের জন্য সংগ্রামে প্রায় শহিদের মত অকালমৃত্যু বরণ করেছেন। নীলবৃত্তান্ত পড়বার সময়ে আমরা সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হরিশচন্দ্রের জীবনী নিয়ে লেখা উপন্যাস অগ্নি মিত্রের *আপোস করিনি* পাশে রাখতে পারি।

নীলদর্পণ, বাপরে বাপ! নীলকরদের কি অত্যাচার, গোবিন্দসামন্ত, উদাসীন পথিকের মনের কথা থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণের ইছামতী উপন্যাস পর্যন্ত অজস্র সাহিত্যকৃতির মধ্যে আমরা নীলবৃত্তান্তের কাহিনী পেয়েছি। ড.পুলিন দাসের বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদ 'সাহিত্য ও ইতিবৃত্ত' এ দিক থেকে খুবই মূল্যবান। ইতিহাসের ছাত্র এবং সাহিত্যের ছাত্র সকলেরই কাজে লাগবে *নীলবৃত্তান্ত* বইটি। আমরা বইটির প্রচার এবং যথোপযুক্ত সমাদর কামনা করি। ড. পুলিন দাস দীর্ঘদিন নীলবৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করছেন। আমরা আশা করব তিনি ইংরেজি ও বাংলা লেখা নীল-সাহিত্য নিয়ে একটি বড় বই লিখবেন। তবে আপাতত যা পেয়েছি সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

নীলবিদ্রোহের দলিল : মন্দিরা ভট্টাচার্য

রিপোর্ট অব দ্য ইনডিগো কমিশন (কম্পাইলড এ্যান্ড এডিটেড) ইউনিভার্সিটি অব নর্থ বেঙ্গল, ১৯৯১।

বসুমতী, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৩

সিপাহী বিদ্রোহ-পরবর্তী যে আন্দোলন ইংরেজ শাসককুলকে চিন্তিত ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিত্তকে বিচলিত করেছিল তা হলো নীলবিদ্রোহ বা নীল-চাষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষী ও মধ্যবিত্তের সংঘবদ্ধ আন্দোলন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষীরা নীলচাষ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। সিপাহী বিদ্রোহ বাঙালি মধ্যবিত্তের সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ ছিল। কিন্তু নীল বিদ্রোহে তাঁদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া শাসককুলের একাংশ অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম প্রচারকারী যাজকের দল এক্ষেত্রে নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তা ছাড়া সিভিল সার্ভিসে কর্মরত বহু ইংরেজের নীলকরদের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ ছিল। নীলবিদ্রোহ দমনের জন্য সবরকমের পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল কিন্তু জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত ঘটনার পূর্বাপর বিচার করার জন্য ইন্ডিগো কমিশন নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশনের মূল রিপোর্টটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক পুলিন দাস মহাশয়ের ভূমিকাসহ, ডিসেম্বর ১৯৯২ তে প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বার্তায় বলেছেন যে, এই রিপোর্টটি সেই সময়কার অত্যাচারের এক কালিমালিপ্ত দলিল। তিনি আশা

প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান প্রজন্মের উৎসুক পাঠক এই দলিলের সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। ঐতিহাসিক মুখ্যসূত্র হিসেবে এই রিপোর্ট যথার্থই এক মূল্যবান দলিল। অন্য একটি সূচনাপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার তাপসকুমার কর্তব্য বা দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মুখ্যসূত্র প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে সেই কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন।

অধ্যাপক পুলিন দাস তাঁর দীর্ঘ ভূমিকা পত্রে নীল কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট ও ভারতবর্ষে নীলচাষের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহ নিয়ে বহু গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি এই রকম — The Blue Mutiny লেখক Blair B. Kling (1977); The History and the Culture of the Indian People-এর অন্তর্ভুক্ত The British Paramountcy and the Indian Renaissance (Vol IX, Part I) লেখক রমেশচন্দ্র মজুমদার। L.S.S.O' Malley কৃত বঙ্গদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ইত্যাদি। নীলবিদ্রোহ ইত্যাদির বিবরণ তৎকালিন বশু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বইতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, হুতোম প্যাঁচার নক্সা (কালীপ্রসন্ন সিংহ), আলালের ঘরের দুলাল (টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তখনকার সামাজিক প্রেক্ষোপট জানার জন্য সংবাদপত্র ও প্রচলিত ছড়ার ব্যবহার জানা অত্যন্ত জরুরি। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজ এই বিদ্রোহে এক মুখ ভুমিকা নিয়েছিল। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সোমপ্রকাশ পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়টের দায়িত্ব পালন করে। সবশেষে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটকের কথা। দীনবন্ধু মিত্রের নীদর্পণে যে সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট তা বহুলাংশে সত্যঘটনা অবলম্বনে রচিত। নদীয়ার গুয়াতেলির হতভাগ্য মিত্র পরিবারের কাহিনী ও হারাণির ঘটনা নবীন মাধবের পরিবার ও ক্ষেত্রমণির করুণ কাহিনী সৃষ্টির মূলসূত্র। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক তৎকালীন সমাজে এক প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ফাদার লঙ-এর জরিমানা ও কারাদণ্ড ইত্যাদির বিষয় মোটামুটি সকলের জানা।

এই বিদ্রোহের আসল ইন্ধনকারী অপরাধী হল অতিরিক্ত মুনাফালোভী, বর্বর একধরনের ইংরেজ নীলকর। বিদ্রোহের সময়কালে যদিও ১৮৫৮-৬০ কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার দীর্ঘদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে যে অপরাধের জন্য চারজন নীলকরের চাষ করার অনুমতিপত্র খারিজ করা হয়েছিল—যেমন হিংসাত্মক ঘটনায় স্থানীয় মানুষজন হত্যা, বেআইনি আটক, উশৃঙ্খল আক্রমণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বেআইনি সাজা দেওয়া এ সবই কোনো না কোনভাবে নীলকরদের হাতিয়ার হিসাবে রয়ে গেছে। আইনত দাসপ্রথা লোপ পেলেও কার্যত এই প্রথা নতুন প্রভুদের হাতে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল।

নীলকরদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি হয়তো থাকতেও পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পক্ষে নীলকরদের হীন ও মানবিক কার্যকলাপ বাধাস্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছিল। এই কারণেই প্রধানত খ্রীস্টান মিশনারীকুল নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু সরকারিভাবে নীলকরদেরই বরাবর জয় হয়েছে। ১৮১০ থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নানা কানুন তৈরি হয়েছে অথচ নীলকরদের অত্যাচার বা তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি। প্রথমে নীলকরেরা ছিল অসংগঠিত ও ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী। কিন্তু ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম থিওবোল্ডের নেতৃত্বে এই ভয়ানক নীলকরেরা ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেন। থিওবোল্ড অত্যন্ত কৃতিত্বের (?) সঙ্গে এই অপরাধীকুলের নেতৃত্ব দেন। এবার তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ না করে সমস্ত এলাকাকে নিজেদের সুবিধা মতো ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের চরিত্র ভিন্ন। এখানে আমেরিকার মতো দলে দলে বৃটিশ নাগরিক আস্তানা গাড়তে আসেনি। নীলকররাই একমাত্র গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। তখন বহু সহৃদয় ইংরেজ এবং কিছু ভারতীয় বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এই বসবাসকারীদের মাধ্যমেই প্রসার লাভ করবে। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত মনে করতেন যে মফঃস্বলে অবস্থিত নীলকরেরাই ভারতীয়দের সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতের সাহায্য করবে। মাঝে মাঝেই ইংরেজ শাসকদের বিবেকের পীড়া উপস্থিত হয়েছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেAct XV-এর মধ্য দিয়ে তারা নীলকরদের ক্ষমতা হ্রাস করবার চেষ্টা করেছে। ইংরেজ নীলকরদের ও ভারতীয়দের মফঃস্বল দেওয়ান আদালতের একই বিচার ব্যবস্তার অন্তর্ভুক্ত করার এই প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। ইংরেজ নীলকরেরা ও তাদের পৃষ্টপোষকেরা এই কানুনকে ব্ল্যাক অ্যাক্ট বলে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আরো একবার কোম্পানি জনরোষের প্রতিক্রিয়ায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নীলকরদের আইনের বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করেছিল। সেবার Act XV -এর মতো শুধু দেওয়ানি আদালতের বিচারাধীন না করে মফঃস্বলে ফৌজদারি আদালতের বিচারাধীন করার শর্ত আরোপ করা হয়। কিন্তু যথারীতি নীলকরদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আবশেষে সমস্তটাই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে নীলকরদের নিজস্ব পত্তনি জমি জায়দাতের সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় প্রকাশিত ভারতীয় পত্রপত্রিকা ও ইংরেজ মিশনারিদের চাপ ও জন আন্দোলনের বর্ধিত আকার ধারণ করে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ বিশেষ বিশেষ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপাতে থাকে। অন্যদিকে নীলকরদের মিত্র পত্রিকা The Englishman ও Bengal Harkaru অনবরত তাদের পক্ষে ওকালতি করতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ থেকে নীলচাষের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। নদীয়ার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সর্বপ্রকারে নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধের চেষ্টা চালান। চাষিরা নীলচাষ বন্ধ করে দেয়। বিদ্রোহ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে নদীয়া, যশোর, পাবনা, মালদা, রাজশাহী ও ফরিদপুরে।

রঙ্গমঞ্চ থেকে ইতিমধ্যে নীলকরেরা বিদায় নিয়েছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মরণপণ করে নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। বাঙালি জনমত যে কোনো মুহূর্তে জনরোষে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় নীল কমিশন গঠিত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে Act XV (যার মেয়াদ মাত্র ছমাস ছিল) প্রবর্তিত হয়। এই আইনে বলা হয় যে, নীলচাষ বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু চাষ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হলে এই আইনে তা পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই আইনের সুপরিকল্পিত ধারাগুলি এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে নীলচাষীরা এক ধরনের সুবিচারের আশা পেল। কমিশন স্থাপনের পরে দলে দলে চাষী কমিশনের সামনে আসতে আরম্ভ করে। তারা আশা করেছিল কমিশন তাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারবে। কমিশনের রিপোর্টটি নভেম্বরে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নীলকরেরা Brahmins and Pariahs নামে লন্ডন থেকে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তাদের স্বপক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। সেই পুস্তিকার মতে ব্রিটিশ লেফটেনেন্ট গভর্নর পিটার গ্রান্ট ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যায়ের নামে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের পুঁজি ও ব্যবসার

ধ্বংসসাধনে তৎপর।

পুলিন দাস তাঁর প্রারম্ভিক টীকায় প্রায় এই সমস্ত ইতিহাস অত্যন্ত প্রাজ্ঞতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। উৎসাহী পাঠক নীল কমিশনের রিপোর্ট অংশটি পাঠ করলে অবশ্যই আইনের ফাঁকি ও বিচারের প্রহসন উপলব্ধি করতে পারবেন। কমিশন সবশুদ্ধ ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। পূর্ব নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী সাক্ষীদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অতিরিক্ত সংযোজন রূপে দেওয়া হয়েছে। সাক্ষীদের নামের তালিকা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাতি, বর্ণ, সম্পদ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়রাই একযোগে অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতেও নীলকরদের রোষ প্রশমিত হয়নি। শিবনাথে শাস্ত্রীর ভাষায় বলা যায়—'না জানি নীলকররগণ কি জাতক্রোধই হইয়াছিলেন। হরিশের মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের ক্রোধ থামিল না। যে আর্চিবল্ড হিলস্ তাঁহার নামে প্রথমে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদন্তের তাঁহার বিধবা পত্নীকে প্রতিবাদী শ্রেণী গণ্য করিয়া আলিপুর কোর্টে দশ হাজার টাকার দাবি করিয়া, দেওয়ানি মোকদ্দমা চালাইতে অগ্রসর হইলেন। হিল্‌সের পশ্চাতে নীলকররগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না।... (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ; পৃষ্ঠা ২০১)। নীলকরদের সর্বশেষ ক্রোধের বিষয়টি ছিল *নীলদর্পণ*। *নীলদর্পণ* ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এবার নীলকরদের দল সত্যই 'হন্নে হয়ে উঠলেন'।

সে সময়কার একটি ছড়ায় আছে—

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারে খার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লং-এর হল কারাগার।...

মূল রিপোর্টটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—The Report, Minutes of Evidences and Appendices। বর্তমান প্রকাশে শুধুমাত্র রিপোর্ট অংশ, সাক্ষীর তালিকা ও সংযোজন ভাগটি প্রকাশ করা হয়েছে। সাক্ষীদের বয়ান অংশটি প্রকাশ করা গেলে তৎকালীন সমাজের আরো সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যেত। সংকলক মহাশয় জানিয়েছেন স্থানাভাব হেতু সেটি ছাপা যায়নি। পরিশেষে বলা যায় যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাধু। ভবিষ্যতে আমরা আরো অন্য মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলের প্রকাশ আশা করব।

জীবনপঞ্জী

জন্ম : ১৯৩০। **জন্মস্থান** : মার্ঘেরিটা, আসাম। **শিক্ষা** : বি.এ (অনার্স) - (প্রেসিডেন্সি কলেজ) এম.এ (বাংলা)- (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পি.এইচ.ডি- (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। **বৃত্তি** : অধ্যাপনা। **কর্মস্থল** : কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ; লেকচারার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির; লেকচারার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর, বাংলাভাষা ও সাহিত্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (প্রথম খণ্ড)। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা।
প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৯০। দ্বিতীয় মুদ্রণ— ফাল্গুন ১৩৯৯।
দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪০৩।

২। রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (দ্বিতীয় খণ্ড)। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা। ভাদ্র ১৩৯৮।

৩। মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা। বৈশাখ ১৩৯৮।

৪। নীলবৃত্তান্ত: এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা। বৈশাখ ১৪০৫।

৫। নাট্যনিরীক্ষণ: মঞ্চদর্পণে, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা। মাঘ ১৪০৮।

৬। Persecution of Drama and Stage-Chronicles and Documents. M.C. Sarkar and Sons, Calcutta.

৭। Report of The Indigo Commission (Edited and Compiled), University of North Bengal. December, 1991.

সমাজসেবা উদ্যোগের বিবরণ পাঠান

বিদ্যামন্দিরের কোন প্রাক্তনী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ সংস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে লিখে প্রাক্তনীবার্তার সম্পাদকের কাছে পাঠান।

লালগড়ের রোজনামচা

স্বামী মেধসানন্দ

গৌর চন্দ্রিকা: ১৯৯২ সালের কথা। কলেজের দায়িত্বভার থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছিলাম মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে যার নাম লালগড়। জায়গাটি বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের সীমানায় প্রধানত সাঁওতাল অধ্যুষিত এক মালভূমি। একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণতনু কাঁসাই নদী। মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। তার মধ্যে দিয়ে লাল কাঁকরের সরু রাস্তা। দূরে দূরে ছড়ানো ছেটানো ছোট ছোট গ্রাম।

লালগড়ের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের মঠের কয়েকটা কুঠিয়া আছে যেখানে সাধুরা কিছুদিন কাটিয়ে যান আর সাধ্যমত সাধনভজন, পড়াশুনাদি করেন। সেবার প্রায় চারমাস কাটিয়েছিলাম সেই পরিবেশে। সেখানে থাকতে থাকতে আমার যে বর্ণালী অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই কিয়দংশ নিয়ে এই লেখা।

গজেন্দ্র গমন : ছাত্রদের সঙ্গে 'বায়োলজিকাল ট্যুরে' সুন্দরবনে গিয়েছিলাম একবার। বলাবাহুল্য স্টীমারে করে। খুব রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় হয়েছিল সেবারের ভ্রমণ। সেবারেই সজনেখালিতে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে দেখেছিলাম বিচরণরত নিঃশঙ্ক একপাল বন্য হরিণ। সে শোভা ভোলা যায় না। আর এই সেদিন সকালে লালগড়ের দিগন্তহীন ধানের ক্ষেতে দেখেছিলাম বুনো হাতির সারি। সেও এক অপরূপ দৃশ্য। ভয়াল অথচ সুন্দর!

তখন সকাল প্রায় প্রায় সাড়ে ছটা। প্রাতঃভ্রমণ সেরে কুঠিয়ার বারান্দা পরিষ্কার করছি। হঠাৎ শোনা গেল একটা অস্বাভাবিক চীৎকার, আর অনেকের ছুটোছুটি। দেখা গেল সকলের লক্ষ্য দূরে অপসৃয়মাণ কালো অনেকগুলো জন্তুর দিকে। প্রথমে ভাবলাম মহিষ। পরে ঠাহর করে বুঝলাম—হাতি। বুনো হাতি। যার কথা এখানে এসে অনেকবার শুনেছি। মুহূর্তে কুঠিয়া বিপ্লব। চীৎকার করে অন্যদের ডাকা। তারপর ছুট্...ছুট্...ছুট্। কাঁসাই নদীর অপর পার থেকে হাতিগুলো এসেছে। প্রায় তিরিশটা। হাতি খুব ফসল নষ্ট করে। তাই অন্য পারের লোকগুলো বিস্তর চেঁচামেচি করে হাতিগুলোকে নদী পার করে দিয়েছে। এ পাড়টা নদীগর্ভ থেকে প্রায় ৩০/৪০ ফুট উঁচু। হাতির দল সেই পাড় ঠেলেই উঠছে। এরপর মোরামের রাস্তা পার হয়ে ধানের মাঠ দিয়ে তাড়াতাড়ি পাড়ি দিয়েছে বনের দিকে। দলের সামনে আর পিছনে দাঁতাল হাতি দুটিই সব চেয়ে বিশাল। সামনেরটাই সম্ভবত দলপতি। এরাই দুজনে অন্য সবাইকে আগলে নিয়ে যাচ্ছে। দলে দু-তিনটে একেবারে বাচ্চা। যাওয়ার সময় হাতিদের শুঁড়ে করে সেকি ফোয়ারার মত জল ছেটানো। কথায় বলে 'গজেন্দ্রগমন'— অর্থাৎ হেলে দুলে ভারিক্কি চালে চলা। তবে প্রয়োচন হলে হাতি যথেষ্ট জোরে চলতে পারে। আর একটা 'কাহাবত' ও বেশ হৃদয়ঙ্গম হল। 'হাতি চলে বাজারমে/ কুত্তা ভখে হাজার'— হাতি বাজার দিয়ে যখন যায় কুকুরগুলো বিস্তর চেঁচামেচি করে, কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। বাস্তবে দেখলামও তাই। কুকুর আর কত মানুষ ছুটেছে, চিৎকার করছে হাতিদের পেছু পেছু। কিন্তু তারা চলেছে রাজার মত। এইভাবে চলতে চলতে একসময়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো দূরে...বহু দূরে বনের গভীরে। কুঠিয়ায় ফিরতের ফিরতে একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বাচ্চা হাতিগুলো নদী পার হল কি করে! নদীর কোথাও তো বুকজল। শোনা গেল, বড়রা নাকি শুঁড়ে করে তাদের উপরে তুলে ধরে পার করে দেয়!... সেদিন লালগড় জুড়ে হাতিরই আলোচনা। তাদের পুনরাগমনের সম্ভবনা নিয়ে আশা আর আশঙ্কা।

ঠিক দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঠেলা : দুপুরে খেতে বসে সেই আলোচনাই চলছে। হাতি। ঠিক তখনই জানা গেল এখান থেকে চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের ধারে একটা ফাঁকা মাঠে হাতিগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। বাচ্চাগুলো অনেক পথ হেঁটে 'আলা' হয়ে গেছে। অর্থাৎ এলিয়ে পড়েছে। ব্যস তৎক্ষণাৎ ঠিক হল দেখতে যেতে হবে। সকালে দেখা হয়েছে ঠিকই। তবু আরও ভাল করে, আরও কাছ থেকে, আরও অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে। আমার সঙ্গী হল কুটিয়ার যুবক কেয়ারটেকার মানস (এখন বিদ্যামন্দির হোস্টেল অফিসে কর্মরত)। তারও আমার মতই উৎসাহ। খাওয়ার পরেই দুজনে দুটো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে কালো মেঘ। হয়তো একটু পরেই বৃষ্টি নামবে অঝোরে। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই। মাথায় গেরুয়া চাদরটা পাগড়ি করে বেঁধে শুরু হল সাইক্লিং। একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল মাত্র। তেমন কিছু নয়। দুপাশে ধানের ক্ষেত। তারা মধ্যে সরু রাস্তা দিয়ে পাহাড়ী-ঝর্ণা থেকে নামা জলের নালা পেরিয়ে, এর উঠোন, তার গোয়ালের পাশ দিয়ে, ছোট ছোট ঝোপের ধার দিয়ে, বড় গাছের তলা দিয়ে চলল আমাদের অভিযান। কিছুদূর যাওয়া হয় আর জিজ্ঞেসা চলে-ওভাই, হাতিগুলো এখন কোথায়? এখও কি সেই মাঠটাতে শুয়ে আছে? কেউ বলে, আছে; কেউ বলে, নেই। আমাদের উৎকণ্ঠাও বাড়ে, আর জেদও চাপে। একটা জায়গায় ক্ষেত ঠাহর করে দেখা গেল 'ধানগাছ ফুটে ডাল' (সেখানকার স্থানীয় পরিভাষায়)। অর্থাৎ তাদের দফারফা। জানা গেল হাতিরা সেখান দিয়েই গেছে। এও জানা গেল হাতির দল জঙ্গলের গভীরতম অঞ্চলে ঢুকে

গেছে। তাদের দেখার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও 'নাস্তি'। মনে যখন আশাভঙ্গের রাগিণী করুণ আলাপ শুরু করেছে হঠাৎ সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের নির্জনতার মধ্যে মাইকের অস্ফুট আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল।

ভেড়া-চ্যালেঞ্জ-টুর্নামেন্ট : এইরকম জায়গায় মাইক। কৌতূহলী হয়ে একে ওকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল রহস্যটা। একটু দূরে একটা খেলার মাঠ আছে। ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে সেখানে। নক্‌আউট প্রথায় খেলা। তবে যেটা সবচেয়ে অভিনব ঠেকল তা হল খেলার পুরস্কার। বিজয়ী দল কোন কাপ বা শীল্ড পাবে না। পাবে একটি আস্ত, মস্ত ভেড়া। এমন চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টের কথা কেউ কখনও শুনেছে? আমরা ভাবলাম হাতি যখন দেখাই হল না তখন অন্তত ভেড়াটা দেখা যাক। তাছাড়া কিছু একটা না দেখে ফিরলে কুটিয়ায় গিয়ে অন্যদের বলব কি!

আবার চললো সাইকেলের চাকা। কিন্তু পথ যে ফুরোয় না। উঁচু-জমি, একের পর এক ছোট-বড় জলের নালা পড়ছে তো পড়ছেই। একটু পরে শুরু হল গভীর বনের অভাস। বিশাল শাল-জঙ্গলের দিগন্ত বিস্তার। ঠিক তার ধার দিয়ে রাস্তা। একটু পরে বনের রাস্তাটা শেষ হল। তারও একটু পরে আমরা পৌঁছে গেলাম খেলার মাঠে। মাইকে মাঝে মাঝে সাঁওতালী বা আদিবাসীভাষায় গান চলেছে। আর চলেছে ঘোষণা। বেশ বড় মাঠ। দর্শকবৃন্দ কম হয়নি। প্লেয়াররা ড্রেস করতে ব্যস্ত। সংগঠকদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রত্যেক দলকে 'এন্ট্রি ফীস' দিয়ে নাম লেখাতে হয়। কুড়ি মিনিট খেলা চলে। দশ মিনিটের মাথায় দিক্ বদল হয়। কিন্তু বিরতি নেই। অফসাইড নেই। পরে খেলা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল বুঝি ফাউলও নেই! সংগঠকদের একজন খাতির করে একটি বিড়ি এগিয়ে দিলেন। সবিনয়ে বলতে হল-'অভ্যেস নেই, খেলে মাথা ঘুরবে'। আতিথেয়তায় কি সহজ আন্তরিকতা। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগল। একটু পরে খেলা শুরু হল। যাকে বলে 'হাড্ডাহাড্ডি' লড়াই। টাইব্রেকারেও মীমাংসা হল না। আর 'সাডেন ডেথ্' নেই। ফলে শেষমেষ লটারিতেই খেলার নিষ্পত্তি। কিন্তু পুরস্কারের ভেড়াটা যে দেখা হল না! জানা গেল ভেড়াটা কেনা হয়ে আছে—ফাইন্যালের দিন তাকে আনা হবে। সংগঠকেরা ফাইন্যালের দিন আসার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন।

স্বপ্নের দেশে : ১৯৮৩ সাল। সেবার আমার সন্ন্যাস হয়। সন্ন্যাসের পর তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলাম হিমালয়ে। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ছিল প্রধান গন্তব্যস্থল কেদারনাথ যাওয়ার পথে প্রায় সাত আট মাইল বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল। বরফের রাজ্যের সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। লালগড়ের এই সমতলে এসে সেই বরফের কথা আবার মনে পড়ে গেলো, দীর্ঘবিন্যস্ত অজস্র কাশফুলের ঘন আস্তরণ দেখে। কাশফুল নদীর পার থেকে শুরু হয়ে চলে গেছে উপরে শিশুগাছের পাতলাবনের মধ্যে। কখনও মেঘের ফাঁক থেকে পড়া সূর্যরশ্মির স্পটলাইটে, কখনও অনাবৃত রশ্মির উজ্জ্বল ফ্লাড্‌লাইটে, পড়ন্তবেলার লাল আলোতে কিংবা চাঁদের নীলাভ জ্যোৎস্নায় সে কাশফুল বিচিত্র শোভা ধারণ করে। ঠিক হল, একদিন নদীর পশ্চিম পাড়ে এই স্বপ্নের দেশে যেতে হবে। যেখানে 'কাশফুল হাজারে হাজারে ফুটেছে'।

সঙ্গী হল শিবু। আর একজন কুঠিয়াবাসী। তাকে দেখলে 'রামের সুমতির' রামের কথা মনে পড়ে। বারাকপুরে বাড়ি। এখানে থেকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে। কুঠিয়ায় পূজা-অর্চনাদিও করে। মাঠে যোগ দেবার ইচ্ছে। হাসি- খুশী, চমৎকার ছেলে। যখন আমরা বেরোলাম তখন বেলা প্রায় পৌনে-পাঁচ। অস্তমিত সূর্যের আলোয় লালরঙ ধরেছে। নদীর খেয়া গেলাম ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ধরে। কিন্তু নৌকা চলছে না। জল এত কম চালানো যায়ও না। বেরিয়ে পড়ে আবার থামে চলে না। থামার কারণও নেই দেখা গেল। সেই অগভীর জল অনেকে হেঁটেই পার হচ্ছে। আমরাও তাদের অনুসরণ করে 'বসুদেবের' মতো 'যমুনা'পার হলাম। স্ফটিক স্বচ্ছ জল। একটু ঠাণ্ডা। স্রোত আছে বেশ। যেতে যেতে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। তারা লালগড়ের কাজ মিটিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। প্রায় পনেরো মিনিট 'কাঁসাইয়ের' তাপহরণ, শীতল জলের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের দেশে। যা ভেবেছিলাম তার থেকেও সুন্দর। চারিপাশ দেখতে দেখতে,বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, কাশফুলের গাছে হাত বোলাতে বোলাতে মনে পড়ে 'আমার সোনার বাংলা' গানটা। 'কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো/ কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে...।

চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু একটা পাখি ডাকছে 'টুঁই!' একটু এগিয়ে একটা 'শিশু' গাছের তলায় বসলাম। চুপচাপ আশেপাশের 'শিশু' গুলো নিশ্চয় আমাদের স্থিরভাবে লক্ষ্য করছিলো। এরপর চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। বিশ্বপ্রকৃতির স্পন্দনের সঙ্গে নিজের স্পন্দন মিলিয়ে দেওয়া। খণ্ডমন মিলে যায় অখণ্ড মনে। খণ্ডকাল বিলীন হয় অখণ্ডকালে। তখন আমি নেই, তুমি নেই। আসা নেই, যাওয়া নেই। রূপ নেই, অরূপও নেই। বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ কিছুই নেই।...

'পাগলা মাস্টার' ও 'ইন্দ্রনাথ' : আর্টগেল্যারি যেমন প্রেমে আঁটা বিচিত্র চিত্রের সংগ্রহশালা তেমনি লোকালয়গুলিও বিচিত্র চরিত্রের সংগ্রহশালা। জীবন্ত আর্ট গ্যালারি। লালগড়ও বাদ যায় না। এই এতদিনে তো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। আলাপ হল। তাদের মধ্যে এখনকার স্কুলের 'পাগলা মাষ্টার' এবং আমাদের কুঠিয়ার 'ইন্দ্রনাথ' অন্যতম। পাগলা মাষ্টার প্রসঙ্গ ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল। এখন 'ইন্দ্রনাথের' কথায় আসি।

তার আসল নাম নিমাই। ভাবে ভঙ্গিতে অনেকটাই 'শ্রীকান্তের' ইন্দ্রনাথ! বয়স কুড়ি ছুঁই ছুঁই। বেঁটে-খাটো মজবুত চেহারা। এমনই মজবুত যে, তারই বর্ণনায়, সে যখন একবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, নার্সরা তার হাতে ভালো করে ইঞ্জেকশান ফোটাতে পারেনি, একটুখানি ফুটিয়ে চলে যায় আর সিরিঞ্জটা ঝুলতে থাকে; পরে ডাক্তারবাবু এসে কোনমতে সামাল দেন। নিমাই আমাদের কুঠিয়ার সূপকার। তবে তার অন্যকাজ এত এবং অন্য বিষয়ে আগ্রহও এত যে তার রান্নার কাজটা যেন 'সেকেন্ডারি'। লেখাপড়া প্রায় জানেই না। কিন্তু যা বুদ্ধি ধরে! নিমাইকে বলা হল,— 'কিরে, কি মাছ এনেছিস! খেয়ে ভাল মনে হচ্ছে না।' ওর ঝটিতি উত্তর, 'মহারাজ, মাছটা ভালই। তবে রান্নার সময় (গলাটা নামিয়ে)...এই একটু খসে খসে পড়ছিল! ' কুঠিয়ার ম্যানেজার মানসের তাড়না— 'নিমাই! কি রুটি করেছিস খাওয়া যায় না।' ওর উত্তর, 'ক্ষিদে নেই তাই বলো। ক্ষিদে থাকলে দেখতে এই উঠে যেতো।' ...মুখে সবসময় হাসি। একটুও বেজার ভাব নেই। ঐ হাসি মুখেই সমানতালে চলেছে তার অবিশ্রান্ত কাজ আর 'কুটুস কুটুস' কথা। এদিকে চরম ডানপিটে। হাতের চাপড়েই কত ইঁদুর আর লাঠির ভায়ে কত সাপ যে মেরেছে! পুকুর থেকে শুধু হাতে মাছ ধরা, মাঠে মাঠে ঘুরে পাখির ডিম জোগাড় করা, ঘুড়ি ওড়ানো—এসবে তার অসীম উৎসাহ।..কথা বলতে বলতে হঠাৎ উদাস হয়ে যাবে। তারপর গাঢ়স্বরে বলতে থাকবে, 'জানেন মহারাজ, আমার সব কথা শুনলে আপনার কান্না পেয়ে যাবে...।' আমি শুনেছি সে কথা। সত্যিই তা কান্না পাওয়ার মতো!

তবে ও যেন এক বুড়ো পাখি। এই খাঁচায় আছে। কিন্তু সন্দেহ হয় কখন উড়ে যাবে...।

আমার কথাটা ফুরোলো...

লালগড়ের রোজনামচার আপাতত এখানেই বিরতি।

...আজ সেই কুঠিয়াবাসের স্মৃতিচারণ করতে করতে মনে হচ্ছে শুধু লালগড়ের নিমাই কেন আমরাও সবাই এক একটা বুনো পাখি। আবার কখন যে উড়ব, কোথায় যে উড়ব তার ঠিক কি! এইভাবেই তো চলছে আমাদের ওড়া জন্ম থেকে জন্মান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে...।'

১৫ অগস্ট ২০০২ তিনটি বিশেষ সভা

১। রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা : সকাল ১১ টায় বিবেকানন্দ সভাগৃহে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও সাধনা বিষয়ে বলবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু।

২। সংবিধান সংশোধন বিষয়ে বিশেষ সাধারণ সভা : বিকেল ২-৩০ মিনিটে।

৩। বার্ষিক সাধারণ সভা : বিকাল ৩টেয়।

সভা ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের আমন্ত্রণ জানাই। আপনাদের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকবে তবে উপস্থিতি বিষয়ে চিঠিতে বা ফোনে আগাম জানাতে হবে। সংবিধান সংশোধন বিষয়ে আপনার মতামত (উপস্থিত থাকতে না পারলে) অবশ্যই পত্রযোগে জানাবেন। সংবিধানের সংশোধন ছাড়া সংসদের কাজকর্ম চালানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে।

কবিতা

সমন্বয়

সব শুচি-স্বর মিলিত হয়েছে রাগিনী ইমন,
সব রাগ-রাগ, অতি রমণীয়, অতি সুন্দর মিলন।
মিলনের ধারা আকাশে বাতাসে, স্থলে জলে বনে বনে—
মিলন-পিয়াসী মনের ভাবনা সব সুখী গৃহকোণে।
মিলন ছাড়া কি বাঁচা যায় বল কোনদিন কোনখানে,
বিরোধ ঘটিয়ে, একা একা থেকে, একমনে একাসনে।
ধর্মে বিরোধ সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে অকরুণ—
কত প্রাণ গেছে ধর্ম-বিরোধে প্রবীণ অথবা তরুণ।

ধর্মের কথা আসলেই আসে ঠাকুরের কথা মনে—
'যত মত তত পথ' যে বাণীটি দিয়েছেন কোনও ক্ষণে।
শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, যীশু, আল্লার ভাব নিয়ে
কত সাধনাই দেখিয়ে গেলেন নিজের জীবন দিয়ে।
সব পথই পথ, পথের প্রান্তে পরম সমন্বয়,
যত দিন যায়, তত লোকে বোঝে, তত হয় তন্ময়।

কবিতা কথা বলে

কবিতা কথা বলে, অনেক কথা বলে—
বুঝেও বোঝে না তো কবি;
কথায় কথায় যেন কেবলই এঁকে চলে
অচেনা অলীক কোন ছবি।

কবির কি অনুভব, কবির কী ভাবনা,
সে তো জানে কবিই শুধু,
চেনা পৃথিবীর থেকে নিয়ে যায় বহু দূরে
যেখানে সবই করে ধূধূ!

যে ছবি এসে যায় কবির ভাবনায়
তাকে শুধু কথা দিয়ে আঁকা—
সে কথা মাঝে মাঝে এমনই হয়ে ওঠে,
সোজা পথ হয়ে যায় বাঁকা।

কবিতা কথা বলে, অনেক কথা বলে—
কবি, তুমি কথা বল কবিতায়;
কথা বলে বলে তুমি প্রিয়তম হয়ে ওঠো,
সাবলীল সৃষ্টির সাধনায়।

বিদ্যামন্দিরের স্মৃতি

বীরেন্দ্র চন্দ্র বর্তী

১৯৪৩ সনে আমি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিররে পড়তে আসি। এখানে আসার ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার পশ্চিম সীমান্তে পিরোজপুর মহকুমা শহরে (বর্তমানে জেলা শহর)। এই শহরের পাশেই ছিল বলেশ্বর নদী (মধুমতী) যা পার হলেই প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলা। পিরোজপুরের তিন মাইল পূর্বে ছিল হুলার হাট স্টীমার স্টেশন যার মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ সমদূরবর্তী পূর্বে বরিশাল ও পশ্চিমে খুলনার সঙ্গে। বরিশাল জেলায় কোন রেললাইন ছিল না। খুলনা থেকে রেলপথে কলকাতা যেতে হত।

বরিশাল টাউনে তখন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত নামকরা ব্রজমোহন কলেজ (বি.এম. কলেজ) ছিল। ১৯৪৩-এ ম্যাট্রিক পাশ করার পর স্বাভাবতই আমার আইনজীবী পিতৃদেব বল্‌লেন— বাড়ির কাছে বি.এম. কলেজে ভর্তি হবার কথা। একদিন আমি খবরের কাগজে বেলুড় কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর একটি বিজ্ঞাপন পড়লাম। তাতে তিনি তাঁর কলেজের ভাল ফল ও বেলুড়ের আবাসিক ছাত্রাবাসেই সস্তায় থাকা -খাওয়ার সুবিধা এবং গঙ্গাতীরের নির্মল আবহাওয়ার কথা লিখেছিলেন। কলেজের মাসিক বেতন ছিল ছয়টাকা এবং হস্টেলের খরচ মাত্র ২৪ টাকা। আমি ওটি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ মহারাজকে ওঁর কলেজে ভর্তি হবার জন্য একটি চিঠি পাঠালাম এবং তাতে কিছু 'কন্‌সেশন' চাইলাম। কলেজে ভর্তি হবার তারিখ এগিয়ে এল। আমার হস্টেলে থাকার জন্য 'সিঙ্গল' লেট তোষক, মশারি প্রভৃতি তৈরী হল। একদিন সকালে আমার বাবা আমাকে বল্‌লেন—"এবার বরিশাল যাওয়ার জন্য সবকিছু গুছিয়ে ফেল। আজ রাত ৯টার স্টীমারে রওনা হব।" আমি বল্‌লাম যে, আমি বেলুড়ে যাব। বাবা বললেন, "সেখান থেকে তোমার পত্রের কোন উত্তরই আসে নাই।" আমার মা মানসিক ভাবে শক্ত ছিলেন। তিনি আমার আগ্রহ দেখে আমার বেলুড়ে যাওয়া সমর্থন করলেন। কিন্তু বেলুড় থেকে কোন উত্তর না আসায় আমি বরিশালে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বিকেল পাঁচটায় স্বামী তেজসানন্দের চিঠি পেলাম। স্বাগত জানিয়ে তিনি আমাকে কলেজের ফি অর্ধেক করে দেবেন বলে লিখেছিলেন। আমার মনে খুব আনন্দ হল। আমার বাবা কোর্ট থেকে সন্ধ্যা ছ'টায় ফিরে বললেন—"চল এবার বরিশাল"। আমি বললাম "বেলুড়ে যাব", এবং স্বামী তেজসানন্দের পত্রটি দেখালাম। বাবা তখন রাজি হয়ে ঐ রাত্রেই হুলারহাট থেকে স্টীমারে আমাকে নিয়ে খুলনা রওনা হলেন। খুলনা থেকে রেলগাড়িতে পরদিন কলকাতা, এবং সেখান থেকে হাওড়া হয়ে বাসে বেলুড়। কলকাতায় এই প্রথম আসা এবং রেলগাড়িতেও প্রথম যাত্রা। কিন্তু কলকাতায় সবাই চেনা চেনা লাগল।

বেলুড়ে বাবার সঙ্গে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দের আলাপ হলে তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি এই ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে বরিশালের বি.এম. কলেজ ছেড়ে এতদূরে এলেন?" বাবা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন: "লেখা-পড়া যা হোক্, আমার ছেলে তো এখানে রোজ গঙ্গাস্নান করতে পারবে।" ধ্যানাত্মানন্দজী অনেকের কাছেই এই গল্পটি বলতেন।

ধ্যানাত্মানন্দজী ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ; চোখদুটো ধ্যানময়। কলকাতার হনিথ দে স্ট্রীটের স্টুডেন্টস্ হোম' থেকে সপ্তাহে একবার ২/৩ দিনের জন্য বিদ্যামন্দিরে ইতিহাসের ক্লাস নিতে আসতেন। তিনি অত্যন্ত দেশপ্রেমী ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বলেছিলাম: "মহারাজ, আপনাকে ইংলন্ডের প্রাক্তনরাজা ৭ম এড্‌ওয়ার্ডের মতো দেখায়"। মহারাজ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে আমকে বল্‌লেন, "তুই কি বল্‌লি? এর চেয়ে রাস্তার একটা নেড়ী কুকুরের সঙ্গে তুলনা করলেও আমি কিছু মনে করতাম না।" উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার কলেজের এক অনুষ্ঠানে উনি আমাকে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করতে বলেছিলেন এবং তার জন্য আমাকে খুব প্রশংসাও করেছিলেন। আমার স্মরণ করে দুঃখ হয় যে, তিনি আমার একটি গবেষণা-গ্রন্থ পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা তাঁকে আমি দিতে পারিনি।

স্বামী বিমুক্তানন্দ ছিলেন কলেজের সেক্রেটারি। শুনেছি গৃহস্থাশ্রমে ইনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়র। এমন মৃদুভাষী, হাসিমুখ সন্ন্যাসী ওখানে কাউকে দেখিনি। উনি কলেজের বারান্দায় আমাদের ক্যারাম খেলার সময় চুপি চুপি আমার পিছনে কখনও কখনও দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন। আমি সবচেয়ে ভাল খেলতাম। তিনি বলতেন: "তোর খেলা দেখতেই আসি।" আমাদের সাপ্তাহিক উপনিষদের ক্লাসও নিতেন। তাঁর অপরিণত বয়সে দেহান্ত হয়।

স্বামী আদিনাথানন্দ (কালীমহারাজ) ছিলেন আমাদের হস্টেল-সুপারেন্টডেন্ট ও লজিকের অধ্যাপক। তিনি শ্রী শ্রী মায়ের শিষ্য ছিলেন। খুব কম কথা বলতেন। আমি লজিকের ভাল ছাত্র ছিলাম বলে বিশেষ স্নেহ করতেন।

আমাদের সময় ইতিহাস পড়াতেন আর একজন মহারাজ— স্বামী ব্রহ্মায়ানন্দ (শচীন মহারাজ)। এঁর ছিল সুন্দর, লম্বা, ছিপছিপে চেহারা; চেখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এম.এ.

পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছিলেন। আই. এ.-তে আমি 'ইতিহাস' বিষয়টি পড়িনি; তাই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। পরে আমি যখন এম.এ.তে ইতিহাস পড়ি তখন কোন একটি পত্রিকায় শচীন মহারাজের সভ্যতার সংকটের উপর ইংরেজিতে লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে খুবই অভিভূত হই। ক্লাসে স্বনামধন্য অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তীর কাছে আমি ঐ বিষয়ে উল্লেখ করলে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনাজীবনে চার জন সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের মধ্যে ছিলেন হীরেন মুখার্জী, সুশোভন সরকার, শচীন মহারাজ এবং একজন আইনজীবী (তাঁর নাম আমার মনে নাই)। পরবর্তী কালে ইনি আমেরিকায় গিয়ে 'মিশন' ছেড়ে দিয়েছিলেন।

স্বামী বীতশোকানন্দ (সাতু মহারাজ) আমাদের হোস্টেলে কালীমহারাজের সহকারী ছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী ছিলেন; পরে সন্ন্যাসী হলেন। খুব লম্বা-চওড়া ছিলেন। ভাল গান গাইতেন। ইনি পরে বার্মায় গিয়েছিলেন এবং কম বয়সে দেহত্যাগ করেন।

অধ্যক্ষ তেজসানন্দ ছিলেন প্রকৃত কর্মযোগী। নিজে বেশ দীর্ঘকায় ছিলেন এবং লম্বা পা ফেলে চলতেন। ইনি এম.এ.তে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। খুব কঠিন, কঠিন ইংরেজি লিখতেন এবং আমাদের 'রিলিজিয়াস' ক্লাস নিতেন। এই বিষয়ের পরীক্ষায় পাশ করা আবশ্যিক ছিল। তাঁর বহির্প্রকৃতি কঠোর ছিল। ছাত্ররা সবাই ভয় পেত। তিনি কড়া শাসক ও নিয়মানুবর্তিতার পূজারী ছিলেন। তিনি শেষরাত্রে উঠে ধ্যান জপ করতেন; সকাল পাঁচটায় নিজে প্রত্যেক ঘরের সামনে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন এবং সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমাদের প্রার্থনা (বৈদিক স্তোত্রাদি পাঠ, আধ্যাত্মিক সংগীত, প্রভৃতি) পরিচালনা করতেন হারমোনিয়ম বাজিয়ে। একজন ছাত্র তবলায় এবং আরেকজন অর্গানে সঙ্গত করত। এর পর উনি ব্যায়াম শেখাতেন। সকালের জলখাবারের পর উনি দড়ি দিয়ে বিদ্যামন্দিরের চার পাশে বাঁশের বেড়া বাঁধতেন। সকাল দশটায় কলেজে যেতেন। বিকালে কখনও কখনও আমাদের খেলা দেখতেন। সন্ধ্যায় আবার আমাদের প্রার্থনা হত তাঁরই পরিচালনায়। পরে উনি গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করতেন। অসম্ভব কর্মশক্তির মানুষ ছিলেন তিনি। আমাকে একদিন বলেছিলেন: "তুই বুদ্ধিমান, ভাল ছেলে। কলকাতার কলেজে পড়লে তুই কম্যুনিস্ট হয়ে যেতিস্।" ১৯৬১-তে উনি আমাকে ডেকে নিয়ে বিদ্যামন্দিরে পার্ট-টাইম লেকচারার-এর কাজ দিয়েছিলেন। তখন আমি চারুচন্দ্র কলেজে ইতিহাস পড়াই।

ওখানে থাকাকালীন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের (আমাদের গীতা পড়াতেন) সান্নিধ্যলাভ করেছিলাম। স্বামী সর্বানন্দের অপূর্ব বক্তৃতা শুনেছিলাম। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্লেপানন্দ (গীতা পড়াতেন) ও স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দের সঙ্গে তখন পরিচয় হয়। স্বামী নিখিলানন্দের বক্তৃতাও শুনেছি।

আমদের গৃহী অধ্যাপক যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সংস্কৃতের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র গুহ, ইংরেজির ভবানী রায়চৌধুরী ও বঙ্কিম মুখার্জী, সিভিকস্‌ের সুবিমল মুখার্জি (ইনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন) ও অংকের ফণীবাবু। দীনেশবাবু গলায় তুলসীর মালা পরতেন এবং ধ্যান করতে করতে পায়চারি করতেন। সুন্দর, ফর্সা চেহারা ছিল। বাইরে গম্ভীর হলেও, ক্লাসে আমাদেরকে কালিদাস ও ভট্টিকাব্য খুব সরসভাবে হেসে হেসে পড়াতেন। পরে উনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়ে 'রিডার' ছিলেন। সুবিমলবাবু ঝড়ের বেগে সিভিকস্ পড়তেন। খুব সাদাসিদে মানুষ ছিলেন।

যেসব ছাত্রের কথা মনে পড়ে তার মধ্যে প্রথম ব্যাচের সচ্চিদানন্দ দর (ইনি সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন) এবং ভাল খেলোয়াড় রবীন মুখার্জীর (ইনি পরে কলিকাতা পুলিশে সার্জেন্ট হয়ে ঢুকে ছিলেন) নাম উল্লেখযোগ্য। রবীনদা আমাদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এসে আমকে একটি 'স্পেশাল প্রাইজ' দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে মনে পড়ে বাবুরাম ব্যানার্জী (পরে বাংলার অধ্যাপক), পরিমল ঘোষাল, অনিল মণ্ডল, ও বলাইদা (পরে কমার্সের অধ্যাপক)-কে। আমার সহপাঠিদের (৩য় ব্যাচ) মধ্যে যাদের কথা মনে পড়ে তারা হলেন কালীমোহন চক্রবর্তী (সবচেয়ে ভালছাত্র) তীর্থপ্রসাদ মাইতি ('অলরাউন্ডার'—পড়াশুনায় ভাল, খেলাধূলায় পারদর্শী ও সুগায়ক), কেদারেশ্বর চক্রবর্তী (সন্দীপের সমৃদ্ধ পরিবারের লোক; বাড়িতে হাতি ছিল), রবীন পাল (খুব মেধাবী ছিল; কিন্তু তার কলমের শ্লথ গতির জন্য পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পেত না; খেলাধূলায় বিরাগী ছিল), মধুমঙ্গল মুখার্জী (গান-বাজনায় ও পড়াশুনায় ভাল), মণি মিশ্র (ভাল ফুটবলার), স্বদেশ ভৌমিক (ভাল খেলোয়াড়), কালীকিংকর মিত্র (ঠাকুরঘর ঝাড়া মোছা করত সানন্দে)। বিদ্যামন্দিরের উত্তরে অবস্থিত একটি বড় পুকুরে বিকেলে কয়েকজন সহপাঠির সঙ্গে সাঁতর কাটতে গিয়ে হঠাৎ ডুবে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।)। রবি রায়, জয়দেব মান্না ও বিবেকানন্দ বাহুবলীন্দ্র। জয়দেব মান্না ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ 'জিমনাস্ট'। তার বুক ও হাত-পায়ের মাস্‌ল্ ছিল খুবই বলিষ্ঠ। খুব খেতে পারত, তবে লজ্জা পেত। রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের বন্ধুরাও কেউ কেউ খাবার ঘরে পরিবেশন করত। সকলেই জান্‌ত যে জয়দেব আমাদের চেয়ে বেশি খেত— অবশ্যই তার শারীরিক ব্যায়ামের জন্য। তাই পরিবেশনকারী জিজ্ঞেস করত— "জয়দেব! আর ভাত চাই?" সে বলত "রেখে যা ভাই এক বালতি।" আবার আর একজন প্রশ্ন করত : "ডাল চাই?" সে বলত : "রেখে যা ভাই এক বালতি"। তবে মাছ তাকে বেশি দেবার উপায় ছিল না। একটার জায়গায় দুটো দেওয়া যেত। পড়াশুনায় বেশি ভাল করতে পারেনি— গভীর চেষ্টা সত্ত্বেও।

বিবেকানন্দ বাহুবলীন্দ্র ছিল ময়নাগড়ের রাজপুত্র। টাকা-পয়সার খরচের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার ছিল সে। প্রত্যেক মাসে তাদেরম্যানেজার বা অন্যকর্মচারী এসে তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে দিয়ে যেতো। মজার ব্যাপার, সে নূতন জুতো কিনে রোজ পরার পর নিজের ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখত, যাতে ধুলো লেগে খারাপ না হয়। আমার সময়ে বাংলা ১৩৫১-র ৮ই ভাদ্র কৃতী ছাত্র অশ্বিনীদা (ইনি আই.এ. পরীক্ষায় ১০ম স্থান অধিকার করেন) একদিন আমাদের হস্টেলে এসে আমাদের সামনে বসে বসেই মুখে রক্ত উঠে মারা গেলেন। তাঁর শোকসভায় একটি কবিতা লিখে পড়েছিলাম। আমকে সবাই কবি বলে ডাকত।

অনেক আগে বিদ্যামন্দরে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে কয়েকবার গিয়েছিলাম। কোন কারণে স্বামী তেজসানন্দ এটি বন্ধ করে দেন। ১৯৬১-তে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন : "তুমি যদি ভার নিতে পার, তবে আমি তা আবার আরম্ভ করার অনুমতি দিতে পারি।" সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রক্তেন ছাত্রদের পুনর্মিলন সভায় দিল্লী থেকে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে বিদ্যামন্দিরে স্মৃতি আমার কাছে অম্লান। একবার সপরিবারে ওখানে গিয়ে আমরা স্বামী তেজসানন্দের আশীষ পেয়েছিলাম।

কবিতা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

নদীর নামটি ভালোবাসা

নদীর নামটি ভালোবাসা
বয়ে যাচ্ছে তোমার আমার সবার দ্বারে
সবার ঘরের পাশ দিয়ে ঐ—আলোয় ছায়ায়
এ-পথ ধরেই যাওয়া আসা: নদীর নামটি ভালোবাসা।
এই নদীরই কূলে কূলে পথের ধারে
বাসা বাঁধা, এই নদীর জলের ধারায়
ধুয়ে মুছে নতুন করে আসন পাতা, মুক্তধারা
—এই নদীরই জলের শিল্পে ঘর-করনা, রান্নাবাড়া,
বাসনকোসন ধোয়া এবং কাপড় কাচা। রৌদ্র-ছায়ায়
পথ চলা, এই নদীর কূলে জিরিয়ে নেওয়া পাতার ঘরে।
গোরু বাছুর স্নান করানো, উঠোন এবং ঘর নিকোনো,
বীজ ছড়ানো মাঠে মাঠে: এমনি করে সারা দিনের
স্বরলিপির সকল সুরে সুর মেলানো
এমনি করেই নদীর কাছে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসা
তৃষ্ণা ভরা ঘড়ায় করে
তুলে রাখা নদীর জলটি: নদীর নামটি ভালোবাসা!

নদীর নামটি ভালোবাসা!-এই নদীরই জলের মায়ায়
শতরূপা স্বপ্নধারায় সাড়া জাগায় ঘরে ঘরে:
সবজি, সবুজ গাছের পাতা, মাঠে মাঠে রূপশালি ধান,
ফুলের ফলের গাছগাছালি, তৃণশয্যা, নম্র বাগান,
টবের ফুলও ফুটে উঠেছে— ফুটে ওঠে— গন্ধ ছড়ায়।
আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা রূপকথা-গ্রাম—এই তো গড়ে
গড়েছিল এবং ক্রমে এই নদীরই স্রোতটি ধরে
সমুদ্দুরে পাল খাটানো, অনেক বড় বন্দরের দৃপ্ত আলো।

এই নদীর স্রোতের জালে নোংরা যত আবর্জনা
ফেলে দেওয়া, স্নান করা ফের, শুচি হয়ে অবগাহন,
নিমজ্জনের পরিতৃপ্তি! বিসর্জনের প্রদীপটিকে জ্বালো
সন্ধ্যা হলে: এমন কি শেষ দিনের যখন প্রস্তাবনা
তখনো এই নদীর জলে ফিরে আসা—: চিতার দাহন
নিভিয়ে আবার ঘরে ফেরা—:
এমনি করেই ভালোবাসার ভরা নদী
সেই যে নদী
নিত্য এবং সবার সেরা নিরবধি
তোমার আমার সবার ঘরের পাশ দিয়ে সে বয়ে যাচ্ছে:
যার যা কাজে নিতে পারো—যেমন ইচ্ছে,
হাত বাড়ালেই সবার কাছে—:
নদীর নামটি ভালোবাসা
একই স্রোতের জোয়ার ভাঁটায় একূল ওকূল
দুকূল ছুঁয়ে— আমাদের সব যাওয়া আসা
নদীর নামটি ভালোবাসা।

কবিতা

কবিতা মানেই এই রহস্যময় বড় জীবনের গান গাওয়া
কবিতা মানেই তো এ-মরুপ্রান্তরে ফুল ফোটানোর খেলা
কবিতা মানেই তো নদীটির কানে কানে চুপে কথা কওয়া
কবিতা মানেই তো মুক্তির মহানন্দে
স্বচ্ছন্দে ভাসিয়ে দেওয়া শব্দের ভেলা
কবিতা মানেই এই জীবনের উদ্দেশ্যে একটি স্তোত্র রচনা
কবিতা, কবিতা ব্যক্তি-জীবনের রক্ত-মাংস,
অস্থি-মজ্জা-স্নায়ু-প্রাণ করে উৎসর্জন
আকাশ-মাটির পুণ্য প্রতিমার অমল অর্হণা।
জীবনের অন্য নাম ভালোবাসা। এবং এ-কবিতা জীবন।
কবিতা মানেই তো হৃদয়ের পুনর্নবা আকূতি ও
অনির্বাণ বিপ্লবী ব্যাপার।
কবিতা মানেই তো জীবনের রূপ-রঙ-রহস্যকে প্রদক্ষিণ
করে
নিজেকে জ্বালিয়ে নিয়ে অবিরাম হয়ে ওঠা প্রহরে প্রহরে।
কবিতা মানেই দৃপ্ত চৈতন্যের সূর্যের চারণ
কবিতা মানেই সব আকাঙ্ক্ষার অভীপ্সার উজ্জ্বল উদ্ধার।

কবিতার নামে তাই প্রত্যহের ব্যবহৃত বিদীর্ণ ধূসরে
মুক্তধারা বইয়ে দেওয়া ফসল-ফল রচনার বিপন্ন ব্যথার
স্বরলিপি: পতিত মানব-জমি স্বহস্তে আবাদ করে
সোনা ফলাবার শুদ্ধ চাষে আত্ম-নিবেদিত হওয়া!
কবিতার নামে তাই নতজানু
সূর্যকরোজ্জ্বল এই জীবনের মন্দিরের কাছে
আমরা সবাই এত সমবেত সার্বিক সম্পন্ন বিশ্বাসে!
কবিতা মানেই লক্ষ চোখ মেলে চেয়ে থাকা মাটিতে
আকাশে
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়-অতীত হয়ে অতল আশ্চর্য
অনুভব
কবিতার অন্য নাম আত্মদান, আত্মজ্ঞান, আলোক উৎসব
অমৃত-যন্ত্রণার উর্ধ্বায়ত চেতনায় অনন্য আকাশ-ভৈরব!

স্বাস্থ্যের দিকে

অমিয়কুমার হাটি

খাওয়া-দাওয়া : খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে আছে পুষ্টির যোগাযোগ। সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের ঘরে যে খাওয়া-দাওয়া, সেটা মোটামুটি ভাবে পুষ্টি জোগাতে পারে। একটু নজর দিলে পুষ্টি বাড়তে পারে।

আজকাল বলা হয়, যা আমরা সাধারণত খাই, যা জোটাতে পারি, যা জোটানো সম্ভব, তার থেকেই যতটুকু পুষ্টি দরকার, জোগা করতে হবে। সেটা অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়। জাতীয় পতাকার নাম মনে রাখলে খাবার জিনিস মনে আসে, যেমন গেরুয়া রঙ— তার মানে, ডাল, সুযি্যকুমড়ো, গাজর, পেঁপে, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি। সাদা রঙ— তার মানে, ভাত, আলু, রুটি, কলা প্রভৃতি। সবুজ রঙ— তার মানে শাক-শব্জি। ক্যালোরি মেপে খাওয়ার চেষ্টা বেশির ভাগ সময় সম্ভব নয়। তবে দেখতে হবে যা খাব তা যেন সুষম হয়। যেন তাতে আমার দরকার মত প্রোটিন বা আমিষ জাতীয়, শর্করা জাতীয় ও তেল বা স্নেহ জাতীয় জিনিস থাকে।

এক এক দিন এক এক রকম ডাল বদলে বদলে খেলে ভাল, কোনদিন মুসুর, কোনদিন মুগ, কোনদিন বা বিউলি। এতে ডালের নানা রকম প্রোটিন পেতে পারি। চাল ডাল সব্জি দিয়ে খিচুড়ি খুব পুষ্টিকর। উপাদেয়ও। যতটুকু তেল জোটে। শিশুদের কখনো সখনো একটু আধটু ঘি মাখন হলে ভাল। সর্ষের তেল খাওয়া যেতে পারে, তবে হার্টের কোন অসুখ থাকলে সূর্যমুখীর তেল বা ঐ ধরনের কোন তেল। সময়ের যা ফল পাওয়া যায়। পেয়ারা, কুল, কলা, জাম, পেঁপে, শশা, আম। আপেল, আঙুর খেতে হবে এমন কোন কথা নেই। ফল না হলে যে চলবে না এমন নয়। শাকসবজি পরিমাণ মত রোজ খেলে নানা ভিটামিন, লোহা, খনিজ লবণের জোগান দেয়, যে সব শরীরের পক্ষে দরকারি, তাছাড়া পায়খানা পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কাঁচকলা, কাঁচা পেঁপে, চালকুমড়ো, সুযি্যকুমড়ো, লাউ, থোড়, এঁচোড়, ডুমুর, পটল, বেগুন, নানা ধরণের শাক (পুঁই, পালং, সজনে, কচু, নটে প্রভৃতি) ইত্যাদি থেকে ভাল পুষ্টি পেতে পারি। ছোট মাছ সব থেকে ভাল। কাঁটা চিবিয়ে খেলে বাড়তি সুবিধা— ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। শিশুদের শেখানো দরকার। মাছ জুটলে মাছ একটা ভাল খাবার, কোন সন্দেহ নেই। বাঙালির খুব প্রিয়। মাছে কোলস্টেরল বেড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। মাছ অন্য সব জায়গাতেও জনপ্রিয় হচ্ছে। মাছের তেলে হার্টের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম। খাবারে গেঁড়ি, গুগলিও যোগ করা যেতে পারে। যতটা পারা যায় সব রকমের খাবার মিশিয়ে খাওয়া ভাল।

ডিমেও ভাল প্রোটিন থাকে। নিশ্চয় খাওয়া যায়। অবশ্য রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা বেশি থাকলে কমাতে হবে। সে তো পরিণত বয়সে। সম্ভব হলে শিশু, তরুণ যুবক দিনে একটা করে ডিম খেতে পারে। ডিম যত বড় পুষ্টি তত বেশি— হাঁস বা মুরগির উপর নির্ভর করে না। যেটা ভাল লাগবে। পুষ্টি কুসুমে বেশি থাকে। কুসুম সাদা হলেও পুষ্টি ঠিক থাকে। কাঁচা খাওয়া ভাল নয়, ডিমের খোসায় অনেক ধরনের বীজাণু লেগে থাকে, সে সব সংক্রমণ হতে পারে। ডিম ভালমত সিদ্ধ না করলে টাইফয়েডের বীজাণু (স্যালমোনেলা টাইফি) মারা যায় না। ডিম সিদ্ধ করার জলে অল্প নুন মিশিয়ে ফোটালে ঐ বীজাণু নষ্ট হয়। ডিম হাফ বয়েলও নও— ফুল বয়েল-পুরো সিদ্ধ করা উচিত। তাতে বীজাণু মরবে।

মাংসের মধ্যে, বয়স বাড়লে মুরগির মাংস ভাল চর্বি কম, কোলেস্টরল বেড়ে যাবার সম্ভাবনা কম। সব মাংস ভাল করে সিদ্ধ করতে হবে। আধসেদ্ধ মাংস খাওয়া বিপজ্জনক বিশেষ করে গোরু বা শূকরের মাংস অবশ্যই ভাল করে সিদ্ধ করতে হবে— না হলে গোরু বা শূকরের মাংস থেকে ফিতে কৃমি হতে পারে।

ভাতের ফ্যান ফেলে দেওয়া বড় একটা অপরাধ। যে ভিটামিন ফেলে দিচ্ছি, এদিকে টাকা দিয়ে বাজার থেকে হয়তো ঐ ভিটামিন কিনছি। আবার হোটেলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভাতের ফ্যানের তথাকথিত 'সুপ' খাই টাকা দিয়ে কিনে। ফ্যান যদি গালিয়ে ফেলতে হয়, সেটাকে নানা ভাবে খাওয়া যায়, পরে একটু সবজি ও মশলা দিয়ে সুপের মত করে নিয়ে। বা আলু-ঘি-ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে। ছোটদের ভাল লাগবে। তরিতরকারি একমনকি আলুর খোসা যত না ফেলা যায় তত ভাল। অনেক কিছু ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, খোসা বা ছিবড়ে জাতীয় দরকারি জিনিস (যা পায়খানা পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে) এইভাবে নষ্ট করি, ফলে দিই।

রান্নার আগে শাকশবজি ভাল করে ধুতে হবে। আজকাল নানারকম কৃত্রিম রঙ করা হয়, সেগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। অনেক কীটনাশক ওষুধও লেগে থাকতে পারে। কৃমির ডিমও লেগে থাকতে পারে। সে সব ধুয়ে যাবে।

প্রেসার কুকারে রান্না ভাল। ক্ষতি হয় না। বরং সুসিদ্ধ হয়। তাড়াতাড়ি হয়, জ্বালানি কম লাগে।

ঠাণ্ডা বাসি খাবার খেলে বদহজম, পেটের অসুখ হবার সম্ভাবনা।

কফির থেকে চা অনেক ভাল। চা কয়েকবার খাওয়া যেতে পারে, তবে কফি বার দুয়েকের বেশি নয়, বাদ দিলে ভাল হয়। চায়ের সঙ্গে দুধ বাদ দিলে, এমনকি চিনিও বাদ দিলে তার মত চমৎকার আর কিছু নেই। শুধু লিকার। তার সঙ্গে যে বিস্কুট খেতেই হবে, নইলে

পাকস্থলী খারাপ হয়ে যাবে, পাকস্থলীতে কেটলীর গায়ের মত চায়ের কষ লাগবে, এসব কিন্তু কষ্টকল্পনা।

দুধ শিশুদের এবং বৃদ্ধদের জন্যে। মিষ্টি শুধু রসনা তৃপ্তির করে, কিন্তু সমাজে দুধের অভাব ঘটায়। দই সম্বন্ধে সেটা বলা যায় না। হজমে সাহায্য করে। শরীর ঠাণ্ডা রাখে। নিয়মিত খাওয়া ভাল। বাড়িতে পেতে নেওয়াই ভাল। দোকানের মিষ্টি দই-এ অনেক রকম ভেজাল, বনস্পতি, রঙ এইসব। টকদই চিনি না দিয়ে খাওয়াই ভাল।

কারুর ডায়াবেটিস থাকলে চিনি, মিষ্টি, আলু, মাটির নিচের প্রায় সব সবজি নিষেধ। ভাত, ডাল, রুটি মাপা। ডাক্তারবাবু যা বলে দেবেন, তার একটু বেশি হলে ডায়াবেটিস বাড়বে। বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে বা লোভে পড়ে ২/৪টি রসোগোল্লা খাওয়া মানেই কিন্তু তাঁদের স্বাস্থ্যের উপর বিরাট ঝুঁকি নেওয়া। বংশে ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকলে মিষ্টি, আলু, চিনি প্রভৃতি খাওয়ার ব্যাপারে, গুরুভোজনের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে।

উচ্চ-রক্তচাপে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের লবণ কমাতে হবে। ডিম মাংসও। মাছ কম ক্ষতিকর। মুরগি চলতে পারে কখনো সখনো।

হার্টের অসুখ আছে যাঁদের, রাতে গুরুভোজন তাঁদের পক্ষে একদম ভাল নয়। রক্তসঞ্চালন অন্ত্রে হয় বেশি, হার্টে কমে যায়, ফলে হার্টের অসুখ বাড়ে, বুকে ব্যথা, ইসকিমিয়া প্রভৃতি।

যাঁরা মোটা হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদেরও মিষ্টি, আলু, মাখন, ভাজাভুজি ইত্যাদি কমাতে হবে। পরিমাণ মত ভাত বা রুটি খেতে হবে। চকোলেট থেকে সাবধান। কোলেস্টেরলের মাত্রা রক্তে বেশি হলে ডিম, মাখন বাদ যাবে, বাদ দিতে পারা যায় খাসি, গোরু বা শূকরের মাংস। মুরগি কখনো সখনো চলতে পারে। মাছ অনেকখানি নিরাপদ, তবে মাছের মুড়ো বা ডিম চলবে না।

দু'বেলা ভরপেটে তো খাবার চাইই। সকালে জলখাবার, বিকালে টিফিন কিছু হলে ভাল। পাউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি, বাদাম, ঘুগনি, সুজি, চিঁড়েভাজা যা হয়। যাদের পরিবারে অন্ত্রের ক্ষতের (পেপটিক বা ডিওডেনাল আলসার) ইতিহাস আছে, তাদের ৩/৪ ঘণ্টা অন্তর কিছু না কিছু খেতে হবে।

মনে রাখতে হবে, মেয়েদের কিছু বেশি পুষ্টি দরকার। এদিক দিয়ে অবহেলা করা হয়। মেয়েরা নিজেরাও অবহেলা করেন, নিজের দিকে না তাকিয়ে স্বামী-পুত্রের জন্যে সব বিলিয়ে দেন। সন্তানসম্ভবাকে ভরপেট খেতে হবে। কেননা শিশু বাড়ে শুধু মায়ের শরীর থেকে পুষ্টি নিয়ে। বেশি খেলে শিশু বড় হবে, প্রসবে অসুবিধা হবে, এ ধারণা ভুল।

বেশি ঝাল, মশলা, লবণ বর্জন করা উচিত। গোলমরিচের ঝালও ঝাল।

নিজের এঁটো খাবার কাউকে না দেওয়া ভাল। কারুর এঁটো খাবার খাওয়াও উচিত নয়। শিশুদের বেলায় নানা অসুখ-বিসুখ— যেমন ডিপথেরিয়া প্রভৃতি এভাবে ছড়াতে পারে।

খাবারের পর ঠিক নয় কোন হজমের ট্যাবলেট খাওয়া। তাতে শরীরের স্বাভাবিক হজমপ্রক্রিয়ার অসুবিধা হয়। হজমপ্রক্রিয়া আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এসব ওষুধ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। খেলাম অথচ নিজের পাকস্থলী ও হজম যন্ত্রগুলোর উপর ভরসা রাখতে পারব না, এ কেমন কথা?

কলা বা দই খেলে ঠাণ্ডা লাগে, সর্দি লাগলে, কাশি হলে খেতে নেই এ সবের কোনটা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। মিষ্টি বেশি খেলে কৃমি হয়, তাও ঠিক নয়। কৃমি আপনা আপনি পেটে জন্মায় সেটাও ভুল ধারণা।

ভাজা, তেলেভাজার পর, ফল খাওয়ার পর জল খাওয়ায় অনেকের আপত্তি। একটা সংস্কার মাত্র। জল খেলেও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। না খেলেও কিছু যায় আসে না। সেই রকম ভাত খাবার আগে না পরে না মাঝখানে জল খেতে হবে? ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই, যার যে রকম অভ্যাস। আগে, মাঝে বা পরে খেলে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খাওয়ার ব্যাপারে বয়সের দিকটাও নজর দিতে হবে। যেমন শিশুদের বেলায়। বড়রা যা খায়, তাই শিশুদের মত করে তৈরি করে দিতে পারা যায়। হয়তো ভাতটা হবে মাখামাখা। রুটি। ডাল। ডালের সুপও শিশু খেতে পারে। থাকবে সয়াবীন, বরবটি। সীম, নানা শাক, সপ্তাহে কোন না কোন দিন, মিলিয়ে দিন, মিলিয়ে মিশিয়ে। ঝোলাগুড় দিয়ে ছোলা, বাদাম বা বাদামের গুঁড়ো। চিঁড়ে ভাজা, কলা, আলু বা কাঁচকলা সেদ্ধ। মুড়ি, খই, যবের ছাতু । দই। খেজুরের গুড়। গুড়ের বেলায় আগে থেকে উনুনে ফুটিয়ে নেওয়া ভাল। তাহলে নিরাপদ হয়ে যায়। এ ছাড়া যা পাওয়া যায়— ডিম, মাছ, গেঁড়ি, গুগলি।

মারাত্মক ভুল ধারণা আছে, মধু খেলে ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার হয়। মধু খেলেও রক্তে চিনি বাড়বে— ক্ষতি হবে, ডায়াবেটিস বাড়বে।

রাতের খাওয়া সেরে নেওয়া উচিত সকাল সকাল—রাত ৮টা থেকে ৮-৩০টার মধ্যে। হজম করবার সময় বেশি পাওয়া যাবে। যাঁদের হার্টের কষ্ট বা অসুখ আছে, হাঁপানি আছে, তাঁদের পক্ষে এই নিয়ম মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।

খাওয়ার পর দিনে ৬—৮গ্লাস জল খাওয়া দরকার। জলের যথেষ্ট যোগান থাকলে কিডনী বর্জ্য পদার্থ অপসারণের কাজ ভাল করতে পারে। কোলের শিশুদের তুলনামূলক ভাবে জল বেশি লাগে, আসে দুধ, চিনি মেশানো জল, প্রভৃতি থেকে, প্রায় এক লিটার প্রতিদিন (বয়স যখন এক বছর)। সকালে দু-এক গ্লাস জল খেলে অন্ত্রের সঙ্কোচন হয়, পায়খানা সুবিধা হয়। অনেকে ছিবড়ে জাতীয় খাবার পছন্দ করেন না। তাঁদের পক্ষে এই প্রক্রিয়াটা কিছুটা কার্যকর হতে পারে। রাতে বারবার ওঠা যাদের সমস্যা, তাদের দিনের বেলাতে যতটা সম্ভব জল খেয়ে নেওয়া উচিত।

জল বিশুদ্ধ নয় মনে হলে ক্লোরিন ট্যাবলেট (হ্যালোজেন, জিওলাইট, ক্লোর ডি ক্লোর, হাইড্রোক্লোনাজেন প্রভৃতি) ব্যবহার করা যেতে পারে। একটা ১০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট প্রায় ২ গ্যালন (১০ লিটার) জল শোধন করতে পারে। ট্যাবলেট মেশাবার আধঘণ্টা পর জল খেতে হবে। জরুরি সময় মোটামুটি হিসাব হল এক হাজার লিটার জলের জন্যে ২.৫ গ্রাম টাটকা ভাল ব্লিচিং পাউডার।

কোন যন্ত্রকে যদি চালান না যায়, তাহলে তাতে আস্তে আস্তে মরচে ধরে, নানা দোষ দেখা দেয়। শরীরের বেলাতেও তাই। শরীর ঠিক মত সচল রাখতে না পারলে জরদ্‌গব হয়ে যায়। যদি অনেকদিন কেউ বসে থাকে, তাহলে সে আর চলাফেরা করতে পারে না। সব সময় গাড়ি, ট্যাক্সি, রিক্সা চড়া যাদের অভ্যাস, তারা হাঁটতে পারে না। হাঁটতে গেলে মনে হয় অভিশাপ ভর করেছে তাদের পায়ে। শরীরে মেদ হয়ত জমে, হয়তো অহঙ্কারও, কিন্তু কোনটাই সুলক্ষণ নয়।

সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে, তত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ছে। খাটাখাটুনি কমছে। আবার কতকগুলো কাজ এমন, যাতে পরিশ্রম একদম দরকার হয় না। কে আর আগ বাড়িয়ে পরিশ্রম করতে যায়! ফলে শরীরে মেদ জমে, শরীর ভারী হয়ে যায়, পরিশ্রম করার ইচ্ছা একদম চলে যায়।

কসরৎ করে শরীর গরম করা (warm up): ঘুম থেকে উঠে বিছানার

পাশে মেঝেয় নেমে এই শরীর গরম করা যেতে পারে। মিনিট দশেক যথেষ্ট। অনেকটা পিটি করার মত বা আসনের মত। কিছু আসনও করা যেতে পারে। অথবা নিজের মত। যেমন চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাঁটু ভাঁজ করে বুকের দিকে আনা, আবার সোজা করা, কোমরের উপর ভর রেখে মাথা তোলা, মেঝেয় নেমে সোজা দাড়িয়ে তারপর গুঁড়ি হয়ে দু'হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁয়া, দু'হাত সোজা উপরে ওঠানো নামানো। যাঁতা চালানোর মত দু'হাত ঘোরানো, চোয়াল বা ঘাড় এপাশ ওপাশ ঘোরানো, উঁচু নীচু নাড়ানো, চোয়ালে হাতের চেটোর চাপ দিয়ে ঘাড় বেঁকানো, গলার পিছন দিকে হাত রেখে পিছনে মাথা বেঁকানো, এই সব। এ ধরনের কিছু কসরৎ করলে শরীর সচল হয়ে উঠবে, মুহূর্তে অবসাদ দূরে চলে যাবে, মনে হবে ঝাঁপিয়ে পড়ি এখনি দিনের কাজে। এ ধরনের কসরৎ সবাই করতে পারে। আসন, যোগব্যায়ামও (ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী) করা যেতে পারে।

ভারি ব্যায়াম: সব থেকে ভাল ব্যায়াম হল নিয়মিত হাঁটা। ভোরে বা সন্ধ্যায় অন্তত দিনে দু'তিন কিলোমিটার। সম্ভব হলে কোন বাগানবাড়িতে, পার্কে, নির্জন রাস্তায়, নিদেন পক্ষে ছাদে, তা'না হলে বারান্দাতে।

ঘুম: কতটুকু ঘুমানো দরকার? কেউ কেউ ভাবতে পারেন, ঘুমটা নিজের উপর। যে যে রকম অভ্যাস করে। তাঁরা ভাবেন নিয়ম মত দু'ঘণ্টা ঘুমালেই চলে যায়, বাকি সব সময় যদি কাজ করা হয়, শরীর খারাপ হয় না।

এটা আগের ধারণা। এখন ধারণাটা বদলেছে। এখন ডাক্তারদের মত হল রোজ কম করে মোটামুটি ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো দরকার। শিশুদের তার থেকে বেশি, কম নয়।

কোন্ বয়সে মোটামুটি কতটুকু ঘুম দরকার

বয়স	ঘুমের সময়
০—১ বছর	২০ ঘণ্টা
১—২ বছর	১৫ ঘণ্টা
১৪ বছর পর্যন্ত	৯—১২ ঘণ্টা
তরুণ ও যুবা বয়স	৮ ঘণ্টা
বৃদ্ধ বয়স	৭ঘণ্টা

ঘুম না এলে মুখ , মাথা, হাত-পা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নেওয়া যেতে পারে। জল, দুধ, চা বা কফিও কেউ কেউ খেয়ে দেখতে পারেন। অনেকে ভাবেন, সিগারেট খেলে ঘুম আসবে । সেটা কিন্তু ঠিক নয়। বরং উত্তেজনা বাড়ায়। উল্টোটাই হয়— ঘুম আসতে চায় না।

রাতে খাওয়ার ঠিক পরে ঘুমাতে যাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর হজমের জন্যে রক্তসঞ্চালন তুলনামূলকভাবে বেশি হয় অন্ত্রের দিকে। খাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে গেলে রক্তসঞ্চালন বেশি হবে মাথার দিকে, তখন হবে হজমের ব্যাঘাত।

রাতে খাওয়ার পর একটু পায়চারি করা যেতে পারে। পরের দিনের কাজের ছক কেটে নিতে পারা যায় এই সময়টাতে। কোন গান শোনা যেতে পারে। বাজনা বাজানো যেতে পারে। দেখা যেতে পারে টিভি। কিম্বা পড়াশোনা কিছুটা করা যেতে পারে। পরিবারের সকলে মিলে একটু গল্পগুজব করলে তো সোনায় সোহাগা। মেয়েরা এদিক দিয়ে একটু এগিয়ে। কীভাবে ঘুমের সাধনা করতে হয়, তাঁরা ভাল জানেন। ঘুমাবোর আগে কেউ চুল বাঁধেন, কেউ মুখে একটু ক্রীম ঘষেন, এইভাবে ঘুমাবার জন্যে তাঁরা তৈরি হতে থাকেন। দেখাও গেছে, গড়পড়তা মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বেশি ঘুমায়, ঠিকমত ঘুমায়।

দুপুরে ঘুম কি স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ? সে রকম কোন প্রমাণ নেই। যাঁর অবসর আছে, দুপুরে খাবার পর একটু ঘুমিয়ে নিলে নাকি ভাল। বাড়ির গিন্নী ও মেয়েরা যাঁরা ঘরে থাকেন, তাঁদের পক্ষে একথা খাটে। তবে অভ্যাস না থাকলে দুপুরে ঘুমালে রাতে ঘুম আসতে দেরি হতে পারে বা ঘুম নাও আসতে পারে।

চুল : চুল ছেলেমেয়েদের সৌন্দর্যের প্রতীক। চুলে তেল না দিলেও চলে, তেল চুলের পক্ষে দরকারি কিছু নয় এবং তেল না দিলে চুল বেশি ভাল থাকে। খুশকি কম হয়। বাজারে যে সব তেল ও স্যাম্পুর বিজ্ঞাপন শহরের দেওয়ালে, খবরের কাগজে, রেডিও ও টিভিতে দেখা যায়, তারা চুলের ক্ষতি করে সব থেকে বেশি। তেলের আরেকটা দোষ, মাথায় ধুলোময়লা জমতে সাহায্য করে বেশিরকম ভাবে। বালিশের ঢাকনা; তোয়ালে গামছা প্রভৃতি চ্যাটচ্যাটে হয়ে যায়। চুলে মাঝে মাঝে সাবান দেওয়া যেতে পারে, তাও ঘনঘন নয়, সপ্তাহে একবার যথেষ্ট। অনেকে বলেন তেল মাথার চুলে না দিলে মাথা ঘোরে, মাথা ধরে। সেটা হতে পারে না। অভ্যাস হয়ে গেছে বলে ওরকম মনে হতে পারে, তেল ছাড়ার কয়েকদিন পর এই ব্যাপারটি চলে যায়। তেল যদি একান্ত মাথায় মাখতে হয়, তাহলে বিশুদ্ধ নারকেল তেল।

এখন অনেক সময় অল্প বয়সেও চুল পাকে, সাদা হয়ে যায়। কালো করার কোন ওষুধ নেই। চুলে কলপ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অনেকের কলপ লাগালে মাথা ও ঘাড়ের চামড়ায় অ্যালার্জি হয়। তাদের কলপ দেওয়া চলবে না। এও মনে রাখা দরকার, যা স্বাভাবিক, তাই মেনে নেওয়া ভাল। চুল বারবার আঁচড়াবার কোন দরকার নেই। এমন কোন প্রমাণ নেই যে তাতে চুলের স্বাস্থ্য ভাল হয়। বরং গোছাগোছা চুল উঠে আসতে পারে, মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। দিনে একবার বা দুবার আঁচড়ালে যথেষ্ট বা বাইরে সেজে বেরুতে গেলে তখন।

টাক সারাবার ভ্রান্ত প্রয়াসে কোন রকম ওষুধ, তেল, যেকোন স্যাম্পু, জড়িবুটি লাগানো উচিত নয়। টাক অনেকটা বংশগত।

স্নান : ঠাণ্ডাজল (20°C বা 68°F); স্বাভাবিক উষ্ণতাসম্পন্ন জল বা গরম জল (মোটামুটি37°C বা 98°F) যার যে রকম অভিরুচি, ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বাভাবিক উষ্ণতার জল আরামপ্রদ—সহ্য করতের পারলে। দিনে অন্তত একবার, কেউ কেউ দু'বার স্নান করেন। ঘাম, ময়লা, ঘর্মগ্রন্থির যে রস বের হয়, ধুয়ে যায়। গায়ে তেল মাখার কোন দরকার নেই। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট। ধুলো আরো জমতে দেওয়া। রোমকূপগুলোকে বাধা দেওয়া। চামড়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, কোনরকম অ্যালার্জি থাকলে তেল মাখলে বাড়তে পারে। সাবানও চামড়ার উপকারী বন্ধু নয়। তেলের মতোই অপরিহার্য নয়। সাবানের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমানো উচিত। জলে নরম তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে অল্পস্বল্প ঘষলে গায়ের ধূলো, ময়লা দূর হয়। কালিঝুলি মাখার কাজ হলে অবশ্য আলাদা কথা, সাবান মাখা ছাড়া উপায় নেই। নরম কোনা সাবান ব্যহার করতে হবে। সাবান অনেক সময় চামড়ার সমূহ ক্ষতি করে। চামড়ার নিজস্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করে। অ্যালার্জি ও চামড়ার রোগ হতে পারে। অ্যালার্জি থাকলে সাবান ব্যবহার করলে অ্যালার্জি বাড়ে।

চোখ : আঙুল যেন চোখের কোণে নেত্রবর্ত্মকলায় (কনজাংটিভাইটিস) না যায়, আঙুল দিয়ে যেন চোখ মোছা না হয়। জয়বাংলা কনজাংটিভাইটিস ছড়ায় এইভাবে। কারুর হয়েছে জয়বাংলা। সে চোখে আঙুল ঘষে ধরল তারপর

বাসের রড। ঐ রড আর একজন ধরল। সে ঐ আঙুল তার চোখে ঠেকাল, তখন তার হবে জয়বাংলা। ছোটবেলায় চোখ দেখিয়ে নেওয়া উচিত। ট্যারা চোখ থাকলে তার চিকিৎসা এখন সম্ভব। চশমা থাকলে সাবান ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিতে পারা যায়, সম্ভব হলে রোজ, নরম কাপড় দিয়ে কাঁচ মুছে নিতে পারা যায়। চশমা ঢিলে হয়ে নাকের নিচে যেন ঝুলে না আসে। ডাক্তারবাবু যদি বলে থাকেন সব সময়ের জন্যে (শোওয়ার সময় বাদ) চশমা পরতে তাহলে তাই করতে হবে। অনেকক্ষণ রোদে থাকলে রোদচশমা ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের ভিতর কখনো নয়। রোদ চশমার যেন কোন 'পাওয়ার' না থাকে। খালি চোখে সূর্য বা সূর্যগ্রহণের দিকে তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজল বা সুর্মা পরা একদম উচিত নয়। কাজল তো কালি তেল দিয়ে তৈরি, চোখ জ্বালা করে। সুর্মায় সিসে থাকে, যা বিষ—চোখের ক্ষতি করতে পারে। চোখের নানা রকম প্রসাধন ক্ষতিকারক। স্বাভাবিক চোখ সব থেকে বেশি সুন্দর। সাধারণ পড়াশুনা, ছবি আঁকার কাজ, সেলাই প্রভৃতি করতে চোখে চাপ পড়ে না। তবে সে রকম মনে করলে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখা যেতে পারে। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ধোওয়ার এমন কিছু দরকার নেই, ধুতে গেলে জল যেন বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয় সেটা দেখতে হবে। চোখের কোণে পিচুটি জমলে হাত পরিষ্কার করে অতি সাবধানে বের করতে হবে। সকালে মুখ ধোবার সময় করা যেতে পারে। নিওন আলো ও বাল্বের আলো তুল্যমূল্য। টেলিভিসন দেখার সময় ঘরের আলো জ্বালা থাকবে। অন্তত তিন মিটার (১০ ফুট) দূর থেকে দেখতে হবে, তাহলে চোখের উপর চাপ কম পড়বে। বই পড়তে হবে চোখ থেকে অন্তত ৪০ সেন্টিমিটার (১৬ ইঞ্চি) দূরে রেখে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ পড়া উচিত নয়। কেউ কেউ বলেন ৪০ মিনিট পড়ার পর অন্তত ১০ মিনিট বাইরে তাকিয়ে থাকতে। সবুজের সমারোহের দিকে দিনে বেশ কিছুক্ষণ তাকালে চোখের আরাম হয়। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ চোখে লাগানো মারাত্মক অপরাধ। মাথা ধরলে ডাক্তারবাবু পরামর্শ না নিয়ে ট্যাবলেট খাওয়া কখনও উচিত নয়। ডাক্তারবাবু হয়তো চোখ দেখাতে বলবেন, বয়স একটু বেশি হলে হয়ত রক্তচাপও মাপবেন, রক্তচাপ বেড়েছে কিনা দেখার জন্যে।

দাঁত : ছেলেবেলা থেকে যাতে দাঁতের যত্ন ভালভাবে নেওয়া হয়, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ খাওয়ার সঙ্গে, হজমের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে। এতে লালা মিশবে ভালভাবে খাবারের সঙ্গে, হজমের হবে সুবিধা। দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে আখ, পেয়ারা, বাদাম প্রভৃতি চিবানো যায়। সকালে উঠে দাঁত মাজতে হবে। আঙুলে সামান্য টুথপেস্ট (বেশি টুথপেস্টের দরকার নেই) বা টুথ পাউডার নিয়ে ঘষতে পারা যায় কয়েক মিনিট। টুথব্রাশ থাকলে দেখতে হবে সেটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ঢাকা রাখতে হবে টুথব্রাশটি, যেন ধুলো না পড়ে। মাঝে মাঝে গরম জলে ফুটিয়ে নিলে ভাল হয়। খুব নরম বা খুব শক্ত হবে না। ব্রাশ করতে হবে উপরের মাড়ি উপর থেকে নিচে, নিচে মাড়ি নিচ থেকে উপরে। একজনের টুথব্রাশ কখনও অন্যজনের ব্যবহার করা উচিত নয়, এর থেকে মারাত্মক সব রোগ এমনকি খারাপ ধরণের জনডিস (হেপাটাইটিস-বি) ছড়াতে পারে।

কোন কিছু খাবার পর ভাল করে হাত দিয়ে দাঁত কচলে নিয়ে জল দিয়ে মুখ ধুতে হবে। মিষ্টি, চকোলেট, আইসক্রিম খাবারর পর এমনকি চিনি দেওয়া চা কফি খাবার পর দাঁত ধুতেই হবে। দাঁতে খালিচোখে দেখা যায় না এমন একরকম জীবাণু থাকে তারা শর্করা জাতীয় খাবার (চিনি, ময়দা, গুড়, চকোলেট, সন্দেশ, আইসক্রিম, মিষ্টি) এর উপর লাখে লাখে বাড়ে, এক ধরনের অ্যাসিড বা টক রস তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে দাঁতের আবরণ বা এনামেল খেয়ে ফেলে। আবার ঐ বীজাণু সাদা চোখে দেখা যায় না এরকম খুব ছোট ফাঁক ফোকর দিয়ে, দাঁতের ভিতর ঢুকে পড়ে হামলা চালায়, ফলে 'কেরিস' হয় দাঁত ক্ষয়ে যায়, গর্ত হয়ে যায়। একে বলে দাঁতে পোকা লাগা; যদিও সত্যি সত্যি পোকা থাকে না, দাঁতে কখনো পোকা লাগে না। আমরা যদি ছোটবেলা থেকে মিষ্টি কিছু খাওয়ার পর ভালভাবে মুখ ও দাঁত ধোওয়ার অভ্যাস করি, তাহলে 'কেরিস' কমবে।

পা : স্বাস্থ্যরক্ষায় পায়ের যত্ন জরুরি। বাইরে থেকে এলে পায়ে ধুলোময়লা থাকলে পা ধুতে হবে তারপর শুকনো করে মুছতে হবে, নইলে পায়ের আঙুলের ফাঁকে হবে হাজা। খুব বেশি জল লাগালেও হাজা হবার সম্ভাবনা। এরকম হাজা হলে চিকিৎসায় না সারলে এবং মধ্যবয়স্ক হলে রক্তে চিনি আছে কিনা দেখিয়ে নিতে হবে।

জুতে বা চটি পা-কে রক্ষা করে। কিন্তু খুব আটোসাটো জুতো পরলে ফোস্কা পড়ে, আবার কড়াও পড়তে পারে। কড়া পড়লে জুতো বদলে হাল্কা জুতো পরতে হবে। তাতে কড়া অনেক সময় ভাল হয়ে যায়। ব্লেড বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে কড়া কাটা উচিত নয়। ডাক্তারবুর পরামর্শ নিতে হবে চিকিৎসার জন্যে।

হাইহিল জুতো না পরা ভাল, কারণ সব সময় গোড়ালি উঁচু থাকে, তাতে শিরদাঁড়ার স্বাভাবিক যে বক্রতা, সেটা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, পায়ে, পায়ের গোছে, কোমরে ব্যথা, স্পনডিলাইটিস প্রভৃতি উপসর্গ জুটতে পারে। নানা ধরনের প্লাস্টিকের জুতো এখন খুব চালু হয়েছে। চামড়া সহ্য করলে পরা যেতে পারে। অ্যালার্জি হলে, চামড়ায় কালচে দাগ পড়তে আরম্ভ করলে বাদ দিতে হবে। কিম্বা মোজা পায়ে দিয়ে পরত হবে।

নিজের ঘর : নিজের ঘর সবাই পরিষ্কার রাখতে চাই। আসবাব কম থাকলে পরিষ্কার রাখতে সুবিধা হয়। আলো বাতাস যাতে ঢোকে, তার জন্যে কিছু সময় দরজা জানলা খোলা রাখা দরকার। কার্পেট ব্যবহার, মোটা পর্দা ঝোলানো আমাদের দেশে তত স্বাস্থ্যকর নয়। হয়তো মনে হয় 'কোজি', কিন্তু বাতাস কমে, ধূলা বেশি জমে। ধুলোয় থাকে চোখে দেখা যায় না এমন নানা মাকড়—যা ফলে অনেকের হাঁপানিও হতে পারে।

উনুনের ধোঁয়া ক্ষতিকর। আমাদের দেশে মেয়েদের ফুসফুসের ও হার্টের নানা অসুখ এর জন্যে দায়ী। ধোঁয়া যাতে কম লাগে দেখতে হবে। সম্ভব হলে ধোঁয়াহীন উনুন করতে হবে। ধূনো, ধূপকাঠি প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। অনেকে আবার ঘরে মশা তাড়াবার ধোঁয়া দেয়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। ধূনো, ধূপকাঠি, ধোঁয়া হলে কার্বন মনোক্সাইড জমে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ধূপকাঠির যে যে কৃত্রিম গন্ধ তাতে অ্যালার্জি হতে পারে, মাথা ধরতে পারে, হাঁপানি বাড়তে পারে। এসব থেকেও পরিবেশদূষণ হয়। বিছানাপত্র নিয়মিত ঝাড়তে হবে, কাচতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে।

কবিতা

অসিতকুমার মিত্র

অন্ধকারে সুগন্ধী ফুল

একবুক মিথ্যেটিথ্যে নিয়ে
চলাফেরা সারাদিন
ওঠানামা সিঁড়ি দিয়ে কতবার
এক দুঃস্বপ্ন হয়ে সময়
যেন জড়িয়ে থাকে
শরীরে সারাক্ষণ।
কিন্তু কখনো যদি গভীর রাতে
বিদ্যুতের ছোটাছুটি আকাশময়
আর প্রলম্বিত হতে থাকে মেঘের গর্জন
চরাচর জুড়ে নিকট থেকে বহুদূর
গুরুগুরু ঢেউ তুলে
যখন পড়তেই থাকে বৃষ্টি
ঝিরঝির ঝমঝম, ভিজিয়ে বাতাস
তখন আশ্চর্য এক অবগাহনের অনুভূতি
আকাশে আচ্ছন্ন করে পরম মমতায়
সারামুখে ফুটে ওঠে পবিত্র সংকল্প সব
সুগন্ধী ফুলের মত
ম ম করে সারাটা বারান্দা আমার
একাকী অন্ধকারে।

আর এক কুরুক্ষেত্র

বুকে এক শিলীভূত অভিমান
যেন বটবৃক্ষের ঘুমন্ত বীজ
নির্জনতায় সিঞ্চিত হলে
সে বৃহৎ হতে থাকে অঙ্কুরিত হয়ে।

চারিদিকে রকমারি মুখের স্রোত
তাদের তাচ্ছিল্য আমাকে আর
আঘাত করে না।
কিন্তু যখন দেখি
খাট বিছানা চেয়ার টেবিল
জানালার বাইরে এক টুকরো আকাশও নিরাসক্ত
পাত্তা দিচ্ছে না আমাকে মোটেই
তখন প্রতিজ্ঞা করে বসি
এমন একটা মহাভারত লিখব এবার
যাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর
বেঁচে থাকবে শুধু
বুনো ঘাস কিছু, শালের জঙ্গল
আর শালিখ পাখিরা একঝাঁক
আর কেউ নয়।

স্মৃতিচারণ

বর্ধমান জেলার সীমান্ত শহর চিত্তরঞ্জন থেকে ১৯৮৪ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে পড়ার তোড়জোড় চলছে। বিশ্বভারতী ছাড়া কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ও বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে গণিত (অনার্স) নিয়ে পড়ার সুযোগ মিলল। বিশ্বভারতীতে হোস্টেল না পাওয়ায় বাকি দুটির মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার্সকেই বেছে নিলাম। কিন্তু বাবার তা ইচ্ছে নয়। আমি সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার জন্য জেদ ধরে বসলাম। কারণ ঐ কলেজের খুব নাম ডাক শুনেছিলাম। কিন্তু বাবার সুচিন্তত পরামর্শে ও আদেশে শেষ পর্যন্ত কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেই আবাসিক বিদ্যামন্দিরেই ভর্তি হতে হোল। বিদ্যামন্দিরের জীবন শুরু করার কয়েকমাসের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, বিদ্যামন্দির নিছক একটি ভালো নম্বর পাওয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু পাওয়ার আছে যা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্লভ।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে ক্লাস শুরুর কয়েকদিন পরে যোগ দিই। বিবেক ভবনের একতলায় থাকবার ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যায় পিন্টু, মানসদের কাছে ধুতি পড়া শিখে প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রার্থনার পর হোস্টেলের অধীক্ষক পূজনীয় দীপঙ্কর মহারাজ ডেকে পাঠালেন। উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"তবলা বাজাতে পারিস? কতদূর শিখেছিস?" আমি উত্তর দিলাম। তারপর বললেন—"নবীন বরণে তোকে লহরা বাজাতে হবে। আমি হারমনিয়ামে মুখ রাখব।" তখনও জানতাম না উনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ। পরবর্তীকালে তবলা সঙ্গতের জন্য প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। আমি এতে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করতাম কারণ ভজনের পর অল্পবিস্তর ভোজনও কখনও কখনও কপালে জুটত।

নবীন বরণের দু-চারদিন পর অধ্যক্ষ মহারাজ মেধসানন্দজী নবাগত ছেলেদের মাঠে বসিয়ে বিদ্যামন্দিরের ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

বেশ মনে আছে উনি হাসতে হাসতে বলছেন—"পড়েছ মোগলের হাতে খান খেতে হবে সাথে।"পরবর্তীকালে বহুবার তার বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। ঐরকম পরিচ্ছন্ন সরস ও প্রাণবন্ত বক্তৃতা আমি পূর্বে শুনিনি। এই বছরই (২০০১ সাল) পুনর্মিলন উৎসবে আমাকে দেখে নাম ধরে ডাকলেন। আমাকে বললেন—"গুপী গায়েন আর বাঘা বায়েন।" বুঝতে পারলাম দীপঙ্কর মহারাজ গান গাইতে উঠলে তবলায় আমার ডাক পড়ত বলেই এই উক্তি। শত শত ছেলেদের নাম ও তাদের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিনি কি ভাবে মনে রাখতেন ভাবলে অবাক হতে হয়। কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের প্রতি এতটাই স্নেহাস্পদ ও আন্তরিক ছিলেন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি আমাদের মনে রাখতে পারতেন।

বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে অধ্যাপক ড: স্বপনকুমার চক্রবর্তীর কথা খুব মনে পড়ে। যা যা মুখে বলতেন তার প্রায় সবই বোর্ডে লিখতেন। আমরা খাতায় লিখতে হিমসিম খেতাম। চামচে করে খাইয়ে দেওয়ার মত শেখাতেন। হাতে ঘড়ি পরতেন না। ক্লাস শেষের পর যা পড়ালেন তার সংক্ষিপ্তসার বলতেন। ঠিক তার ১/২ মিনিট পরই ঘণ্টা পড়ত। কি অভাবনীয় সময়জ্ঞান! অধ্যাপক মোহনলালবাবুকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের জন্য খুব ভয় করত। পরবর্তীকাল বুঝতে পেরেছি তিনি যতটা গাম্ভীর্যের মোড়কে নিজেকে আবৃত করে রাখতেন তারা চেয়েও বেশি ছাত্রবৎসল। ছাত্রজীবনের পরবর্তী সব কটি পুনর্মিলন উৎসবে যোগ দিয়েছি। মোহনলানবাবু কোনো বারেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। বলতেন—"আজ আমরা সবাই প্রাক্তনী।" অধ্যাপক সমরেশ বাবুর ক্লাসে পড়া ছাড়াও সরস গল্প একটা উপরিপাওনা ছিল। তাঁর ক্লাসে একটু রিলিফ পেতাম। এই সেদিনও আমার অফিসে এসে কিছুক্ষণ গল্প করে গেলেন। খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। সব শেষে বিভাগীয়প্রধান শচীবাবু সম্বন্ধ বলি, ঐরকম অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অথচ সরল জীবনযাত্রার মানুষ এযুগে বিরল।

বছর দুয়েক আগে কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। স্বপনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই গালে একটু মৃদু চড় মেরে বললেন—"প্রদর্শনী দেখে এসে দেখা কোরো। আমি স্টাফরুমে থাকব।" গণিতের মডেলগুলো দেখে উনার সঙ্গে দেখা করলাম। পাশে বসালেন। অনেক গণিতবিদদের অজানা সব গল্প বললেন। মহারাজকে ম্যানেজ করে একটা টিফিনের প্যাকেট আদায় করে আমাকে দিলেন। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা উপলব্ধি করে চোখে জল এসে গিয়েছিল। মূল্যবোধহীন বাইরের জগতের সঙ্গে মানবিকতা ও আতিথেয়তার মূর্তপ্রতীক স্বামীজিকল্পিত ও ধারণাপুষ্ট বিদ্যামন্দিরের ফারাকটা মনে প্রাণে বুঝতে পারলাম।

এছাড়া কলেজ ও হোস্টেলের অশিক্ষক কর্মচারীদের অকৃত্রিম ভালোবাসাও ভুলবার নয়। বিকালে সকলে একসঙ্গে ভলিবল খেলতাম। এই খেলায় প্রশান্ত মহারাজ, সত্যব্রত মহারাজ (যিনি আজও সেই পুরোনো ফর্ম ধরে রেখেছেন,) দীপঙ্কর মহারাজ, অরবিন্দ মহারাজ এমনকি স্বয়ং অধ্যক্ষ মহারাজও যোগদান করতেন। আমরা যে সকলেই বিদ্যামন্দির নামক পরিবারের পরিবারভুক্ত, এই অনুভূতি তখনই আমাদের জন্মেছিল। মা-বাবাকে ছেড়ে দীর্ঘদিন বিদ্যামন্দিরে অতিবাহিত করতাম। মহারাজদের অভিভাবকসুলভ স্নেহ এবং বন্ধুদের সহমর্মিতাবোধ ও সহযোগিতা সেই অভাবকে পরিপূর্ণ করত। আজ অকপটে বলতে চাই— আমি ভাগ্যবান ও ধন্য।

এবার স্বীকারেক্তির পালা। একবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আমরা কয়েকজন ভারত-জাপান ভলিবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। অনুমতি না পাওয়ার আশঙ্কায় বিনানুমতিতেই চলে গিয়েছিলাম। ডাইনিং হলের সঞ্জয়দাকে টিকিট কাটার জন্য আগে থেকেই ম্যানেজ করে রেখেছিলাম। বেশ রাত্রে কলেজে ফিরে মেইন গেট টপকে ঢুকতে হয়েছিল। আর একবার ১৯৮৭ সালে ঐ একই স্থানে কয়েকজন বন্ধু মিলে অধীক্ষকের অনুমতি ছাড়াই পুজোর গান শুনতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া মাসে একটা-দুটো সিনেমা রবিবারের দুপুরের জন্য বরাদ্দ থাকত। সিনেমা দেখে ফিরে এসে যথারীতি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনাকক্ষে উপস্থিত থাকতাম। আমাদের দৌড় অবশ্য সালকিয়া, বালী, উত্তরপাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কতিপয় স্মার্ট ছেলে অবশ্য এস্‌প্লানেডেও যেত। প্রার্থনার পরই অধীক্ষক মহারাজ তাদের ডেকে পাঠালে বুঝতাম তাদের কপালে দুঃখ আছে। অনেকে রবিবার অধীক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাড়ি যেত (অবশ্য দুপুরে মাংস-ভাত খাওয়ার পর)। সবশেষে বলি, আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের হোস্টেল অধীক্ষক প্রয়াত স্বামী কালিকাত্মানন্দজীর কথা। তাঁকে হয়তো আমরা অনেক জ্বালাতন করেছি। তাঁর ঘরের উপর লেখা SUPERINTENDENT কথাটা হেরফের করে SUPER RIN করেছি। শান্তনু তাঁর গলার স্বর অবিকল নকল করত। এতে আমরা তখন পুলকিত হতাম। বিগত বেশ কয়েক বছর তিনি বাত ও অন্যান্য উপসর্গে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। গত ২০০০ সালের অগস্ট মাসে তাঁর চরম অসুস্থতার খবর পেয়ে আমি আর পিন্টু সেবা প্রতিষ্ঠানে গেলাম। আমরা প্রণাম করলাম। নাম জিজ্ঞাসা করে কাজকর্মের খবর নিলেন। কথাবার্তায় কিছুটা অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল। মনে হল, ঠিক চিনতে পারছেন না। সম্ভবত মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছিল। তার প্রায় সপ্তাহখানেক পর তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বিদ্যামন্দির জীবন নিয়ে লিখতে বসে মনে হচ্ছে আরও ঘটনা ও মানুষের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু তা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই পরিশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা অর্থাৎ তাঁদের সন্তানেরা যেন ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়ে স্বামীজি পরিকল্পিত বিদ্যামন্দির গঠনের উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

ঐ যে জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐস্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরণে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও অন্যান্য সংবাদ

২০০১-২০০২

প্রাক্তনী সংসদ ও বিদ্যামন্দিরের যৌথ উদ্যোগে এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলন ও যুবদিবস পালনের আয়োজন হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। যথারীতি, এবারও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে এই জেলায় অবস্থিত ভাব প্রচার পরিষদের বিভিন্ন সংগঠন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের একাধিক পার্ষদের স্মৃতিধন্য, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যমণ্ডিত এই জেলায় এই উৎসবের আয়োজন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত এর আগে সাতটি জেলায় প্রাক্তনী সংসদ এই ধরণের সম্মেলন আয়োজনের পর অষ্টম জেলা হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে বেছে নিল।

এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়— কমিটির সভাপতি পদে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ ও সম্পাদক পদে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের সম্পাদক অন্নপূর্ণানন্দজীকে নির্বাচন করা হয়। সংগঠনের সুবিধার জন্যে উত্তর ২৪পরগনা জেলাকে ছয়টি অঞ্চল বা 'জোনে' ভাগ করা হয়। এগুলি হল — সুন্দরবন, বসিরহাট, গোবরডাঙা, সোদপুর, হাবড়া ও দমদম। অঞ্চলগুলিতে তৈরী হয় আঞ্চলিক কমিটি। এই কমিটিগুলির পরিচালনায় জেলা ৩৬৪টি বিদ্যালয়ের মোট দু'হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আঞ্চলিক স্তরে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বারাসাত-এর তত্ত্বাবধানে ২৩ ডিসেম্বর ২০০১ এ বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল জেলাস্তর প্রতিযোগিতাগুলি। প্রায় চারশোর মত প্রতিযোগী নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে সাহায্য করেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে বিদ্যামন্দিরের তরুণ অধ্যাপকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

১৩ জানুয়ারি ২০০২-এ বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে আয়োজিত হ'ল জেলাস্তর প্রতিযোগিতাগুলির পুরস্কার বিতরণী উৎসব। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চলের আহ্বায়করা তাঁদের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করলেন। বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হল। ছাত্র প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তর সভা পরিচালিত হল। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে আবৃত্তি পরিবেশন করলেন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ ও সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বিদ্যামন্দিরের আর এক প্রাক্তনী স্বামী অনিমেষানন্দ।

এই উপলক্ষ্যে নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু এবং সন্দীপন সেন-এর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হল একটি স্মারক পত্রিকা। সুদৃশ্য এবং সুসম্পাদিত এই পত্রিকাটিতে স্থান পেয়েছে নির্বাচিত জেলাকেন্দ্রিক বেশ কিছু মূল্যবান রচনা, দিব্যজীবন ও বাণী, স্মরণীয় মনীষীদের নিয়ে লেখা কিছু প্রবন্ধ। সংকলনটি সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। এইভাবে এবারের সম্মেলন শেষ হল।

বিদ্যামন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী : গত ২২ জানুয়ারি ২০০২ বিদ্যামন্দিরে হীরকজয়ন্তী স্মারক বিশেষ শিক্ষাপ্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেদিন সকালেই আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল, অনিশ্চয়তা ছিল তাঁর আসার বিষয়েও। শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন—যথোচিত শ্রদ্ধায় উদ্বোধন করলেন শিক্ষাপ্রদর্শনী। সঙ্গে ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিভাগের ঘরে ঢুকে সোৎসুক কৌতূহলে দেখলেন প্রদর্শনীর একাংশ। নানা প্রশ্ন করলেন। তারপর নিরাপত্তা কর্মীদের একরকম চমকে দিয়ে ঢুকে গেলেন বিবেকানন্দ সভাগৃহে। সামান্য সময়ের জন্য সভাগৃহের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে দু'চার কথা বললেন—পাঠ করলেন স্বামীজীর রচনা থেকেও। তাঁর সংক্ষিপ্ত আন্তরিক ভাষণ সমবেত সকলকে ছুঁয়ে গেল। স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যামন্দিরে এলেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিদ্যামন্দির পত্রিকার হীরকজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত : ঐ দিনেই বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে বিদ্যামন্দির পত্রিকার বিশেষ হীরকজয়ন্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ পত্রিকাটি উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সমবেত করতালিধ্বনির মধ্যে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী আবরণ উন্মোচন করে পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এবারের পত্রিকাটিতে বর্তমান ছাত্র, অধ্যাপক, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ছাড়াও লিখেছেন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক। কিছু দুর্লভ পুরোনো ছবি ছাড়াও পুনর্মুদ্রণ অংশে সংকলিত হয়েছে পুরোনো বিদ্যামন্দির পত্রিকা থেকে নেয়া বেশ কয়েকটি অত্যন্ত

আকর্ষণীয় রচনা। প্রসঙ্গত। এর আগে বিদ্যামন্দিরের রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী এবং স্বামীজী শতবর্ষেও বিদ্যামন্দির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারত-জ্যোতি পুরস্কারে সম্মানিত অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল সরকার : বিগত ৩০মে ২০০১ 'ভারতজ্যোতি' সম্মানে ভূষিত হলেন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী দ্বিজেন্দ্রলাল সরকার। নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, শিল্প, চারুকলা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন। শিক্ষা-সংগঠক এবং সমাজসেবী হিসেবে এবারে এই পুরস্কার পেলেন ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল সরকার। সশ্রদ্ধ অভিনন্দন প্রাক্তনী শ্রীযুক্ত সরকারকে।

সম্মানিত হলেন প্রাক্তনী অধ্যাপক বলাই সেনগুপ্ত : বিদ্যামন্দিরে দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষের (৪২-৪৪) ছাত্র অধ্যাপক সেনগুপ্ত দীর্ঘ একটি দশকেরও বেশি সময় ধরে অধ্যাপনা করেছেন বিদ্যামন্দিরে। বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন ওতঃপ্রোত ভাবে। তিনি ছিলেন তেজসানন্দজীর বিশেষ স্মৃতিধন্য ছাত্র। তিনি সেকালের বাণিজ্য বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক বলাই সেনগুপ্ত। বিদ্যামন্দিরের ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী পাঠক্রম চালু হল যখন— তখন তিনি চলে গেলেন নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজে। ডিগ্রিস্তরে বিদ্যামন্দিরের পাঠক্রমে বানিজ্য বিষয় ছিল না বলেই অনেক বেদনায় তাঁর চলে যাওয়া। ছাত্র দরদী, শিক্ষার স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ এই প্রাক্তনীকে সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বর্দ্ধিত করল শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ করে। যোগ্য অধ্যাপকের এই সম্বর্ধনা একটু বিলম্বিত হলেও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের। তিনি প্রাক্তনী সংসদের একজন মান্য সদস্য। আমরা তাঁর দীর্ঘতর জীবন এবং সুস্থতা কামনা করি।

তারাশংকর সামন্তের কৃতিত্ব : তারাশংকর সামন্ত ১৯৮৩-৮৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনী। পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত কর্মস্থল হল 'ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক নোট মুদ্রণ লিমিটেড'। ছাত্রজীবনেই উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেখে হস্টেলের মহারাজ 'বিজ্ঞানী' নামে ডাকতেন। এখন সে সত্যিকারের বিজ্ঞানী, নোট জালিয়াতি প্রতিরোধে বিশেষ একটি নাম্বারিং সিস্টেম আবিষ্কার করে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। কঠোর পরিশ্রম এবং সৃষ্টিশীল মানসিকতার জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠান। তার এই কৃতিত্বে আমরাও গর্বিত।

MAA TARA INDUSTRIES

MANUFACTURERS AND REPAIRERS OF POWER AND
DISTRIBUTION TRANFORMER AND REPAIRERS OF
ALL TYPES OF TRANSFORMERS (APPROVED BY S.S.I. UNIT)

FACTORY & OFFICE : BHAKURI MORE, CHALTIA
BERHAMPORE, DIST. MURSHIDABAD

PHONE NO: 50765
STD NO: 03482

BRANCH OFFICE : 112, BARUIPARA LANE
CALCUTTA 700 035

লেখক-পরিচিতি

রামবহাল তেওয়ারী (১৯৫৬-৫৭)
বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

গৌতম গোস্বামী (১৯৭৩-৭৬)
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের যুগ্ম-সম্পাদক।

তপনকুমার ঘোষ (১৯৬৯-৭৩)
অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক। বিশিষ্ট সংগঠক।

বন্দিতা ভট্টাচার্য
লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের প্রাক্তন প্রধান।

পুলিন দাস
বিদ্যামন্দির এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট নাট্য গবেষক।

স্বামী মেধসানন্দ (১৯৬২-৬৫)
বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। বর্তমানে জাপানে বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ।

অচিন্ত্যকুমার আদিত্য (১৯৫৪-৫৬)
বাজেট কনট্রোলার ও কবি।

বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৪৩-৪৪)
বিদ্যামন্দিরের আদি পর্বের আবাসিক ও ছাত্র।

নচিকেতা ভরদ্বাজ (১৯৪১-৪৩)
স্বনামধন্য কবি ও অনুবাদক। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন আধিকারিক।

অমিয়কুমার হাটি (১৯৫২-৫৪)
বিশিষ্ট চিকিৎসক। রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এবং স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর প্রাক্তন অধিকর্তা।

অসিতকুমার মিত্র (১৯৫৫-৫৭)
কবি।

সুশান্ত দে (১৯৮৪-৮৭)
প্রাবন্ধিক।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭৩-৭৬)
সাহিত্য অকাদেমির পূর্ব ভারতের সচিব।